সাহিত্যমেলা

বাংলা । ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভূমিকা

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্যমেলা' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্যমেলা' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা যোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি ঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

'সাহিত্যমেলা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'আমাদের চারপাশের পৃথিবী'। বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। আমাদের চারপাশের জগতের নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতে-কলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখক সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৩ পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী প্রণবেশ মাইতি। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে সংক্ষিপ্ত 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

স্বাতী চক্রবর্তী অপূর্ব সাহা ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায় দেবযানী দাস দেবলীনা ভট্টাচার্য রূপা বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

প্রণবেশ মাইতি

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল দীপ্তেন্দু বিশ্বাস অনুপম দত্ত পিনাকী দে

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **প্রণবেশ মাইতি**

ভরদুপুরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওই যে অশথ গাছটি, ও তো
পথিকজনের ছাতা,
তলায় ঘাসের গালচেখানি
আদর করে পাতা।
চরছে দূরে গোরুবাছুর,
গাছের তলায় শুয়ে,
দেখছে রাখাল মেঘগুলো যায়
আকাশটাকে ছুঁয়ে।

খোলের মধ্যে বোঝাই করে
শুকনো খড়ের আঁটি
নদীর ধারে বাঁধা কাদের
ওই বড়ো নৌকাটি।
কেউ কোথা নেই, বাতাস ওড়ায়
মিহিন সাদা ধুলো,
ভরদুপুরে যে যার ঘরে
ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।
শুধুই কী আর মানুষ ঘুমোয়,
যে জানে, সে-ই জানে
আঁচল পেতে বিশ্বভুবন
ঘুমোচ্ছে এইখানে।

হা
তে
ক
ল
মে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪) : জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। *সত্যযুগ* পত্রিকার সাংবাদিকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন, পরবর্তীকালে *আনন্দবাজার পত্রিকা* -র সঙ্গে যুক্ত হন। বহুদিন তিনি *আনন্দমেলা* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা কবিতার জগতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *নীল নির্জন, অন্ধকার বারান্দা, কলকাতার যীশু* প্রভৃতি। *উলঙ্গ রাজা* কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার লাভ করেছেন।

১.১ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মস্থান কোথায়?
১.২ তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ 'অশথ গাছ'কে পথিক জনের ছাতা বলা হয়েছে কেন?
২.২ রাখালরা গাছের তলায় শুয়ে কী দেখছে?
২.৩ নদীর ধারের কোন দৃশ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে?

শব্দার্থ : গালচে—কার্পেট, ঘরের মেঝেতে পাতার শৌখিন ফরাশ। খোল— ফাঁপা আবরণ। মিহিন —সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র।

৩. **একই অর্থযুক্ত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :** তৃণ, তটিনী, গোরক্ষক, পৃথিবী, জলধর।

৪. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করো :** ঘাস, রাখাল, আকাশ, মাঠ, আদর, গাছ, লোক।

৫. **পাশে দেওয়া শব্দগুলির সঙ্গে উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো :** নদী,আদর, বাতাস।

৬. **নীচের বাক্য বা বাক্যাংশগুলির থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় চিহ্নিত করে উদ্দেশ্য অংশের সম্প্রসারণ করো:**

৬.১ ওই যে অশথ গাছটি, ও তো পথিকজনের ছাতা।
৬.২ কেউ কোথা নেই, বাতাস ওড়ায় মিহিন সাদা ধুলো।
৬.৩ আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে।

৭. 'বিশ্বভুবন' শব্দে 'বিশ্ব' আর 'ভুবন' শব্দদুটির একত্র উপস্থিতি রয়েছে যাদের অর্থ একই। এমন পাঁচটি নতুন শব্দ তুমি তৈরি করো।
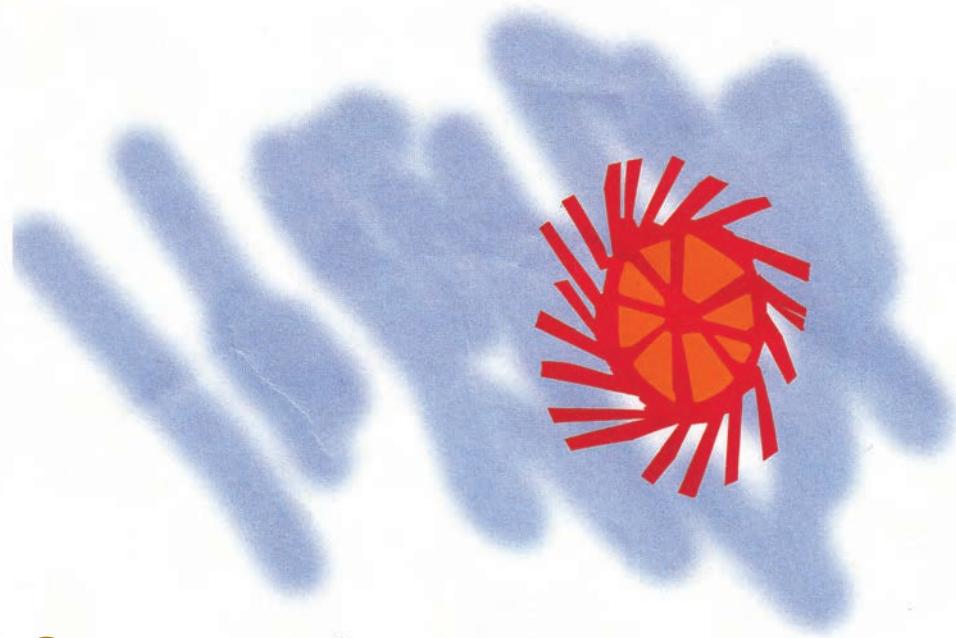
৮. ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো (কোনটিতে কাজ চলছে/ কোনটিতে বোঝাচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেছে) :

৮.১ চরছে দূরে গোরুবাছুর।

৮.২ দেখছে রাখাল মেঘগুলো যায় আকাশটাকে ছুঁয়ে।

৮.৩ নদীর ধারে বাঁধা কাদের ওই বড়ো নৌকাটি।

৮.৪ বাতাস ওড়ায় মিহিন সাদা ধুলো।

৮.৫ আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে।

৯. নীচের বাক্যগুলির গঠনগত শ্রেণিবিভাগ করো (সরল/ যৌগিক/জটিল) :

৯.১ তলায় ঘাসের গালচেখানি আদর করে পাতা।

৯.২ ওই যে অশথ গাছটি, ও তো পথিকজনের ছাতা।

৯.৩ ভরদুপুরে যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।

৯.৪ যে জানে, সেই জানে।

১০. 'ওই যে অশথ গাছটি...' অংশে 'ওই' একটি দূরত্ববাচক নির্দেশক সর্বনাম। এমন আরও কয়েকটি সর্বনামের উদাহরণ দাও। যেমন — ও, উহা, উনি, ওঁরা ইত্যাদি।

১১. 'পথিকজনের ছাতা'— সম্বন্ধপদটি চিহ্নিত করো, কবিতায় থাকা সম্বন্ধপদ খুঁজে লেখো আর নতুন সম্বন্ধপদ যুক্ত শব্দ তৈরি করো। যেমন — গোঠের রাখাল, দুপুরের ঘুম।

১২. 'ওই বড়ো নৌকাটি' বলতে বোঝায় একটি নৌকোকে। নৌকার সঙ্গে এখানে 'টি' নির্দেশক বসিয়ে একবচন বোঝানো হয়েছে। এরকম একটিমাত্র একবচনের রূপ বোঝাতে কোন কোন নির্দেশক ব্যবহৃত হতে পারে, তা উদাহরণ দিয়ে লেখো।

১৩. কবিতা থেকে বহুবচনের প্রয়োগ রয়েছে এমন শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো। প্রসঙ্গত , শব্দকে আর কী কী ভাবে আমরা বহুবচনের রূপ দিতে পারি, তা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

১৪. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১৪.১ 'আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে'—কবির এমন ভাবনার কারণ কী?

১৪.২ 'ভরদুপুরে' কবিতায় গ্রামবাংলার এক অলস দুপুরের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতায় ফুটে ওঠা সেই ছবিটি কেমন লেখো।

১৪.৩ কোনো এক ছুটির দিনে দুপুরবেলায় তোমার বাড়ির চারপাশ জুড়ে কেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

১৪.৪ তোমার দেখা একটি অলস দুপুরের ছবি আঁকো।

সেনাপতি শংকর

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এখানে বাতাসের ভিতর সবসময় ভিজে জলের ঝাপটা থাকে। মনে হবে কে যেন ভালো করে বেটে জলের মিহিদানা মিশিয়ে দিয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়— পাঁচ-সাত মাইলের ভিতর বঙ্গোপসাগর। পাগলা বাতাসে তার ঢেউয়ের গুঁড়ো সবসময় উড়ে আসছে।

আকন্দবাড়ি স্কুলের ক্লাস ফাইভে বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্লাস। বইতে পাখির ছবি। কাছাকাছি ভেটুরিয়া, সাঁইবাড়ি, ঘোলপুকুর আর আকন্দবাড়ির জনা ত্রিশেক ছেলেমেয়ে বসে।

স্কুলবাড়ির ছাদে টালি। মাটির দেয়াল। মাটির মেঝে। কাঠের বেঞ্চ। জানালায় কোনো শিক নেই। সেই জানালা দিয়ে মেঘ দেখা যায় আকাশের। দেখা যায় পাখি উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে একটি ছেলে আনমনা হয়ে পড়েছিল। নারকেল গাছের মাথার ওপর দিয়ে কত উঁচুতে ডানা মেলে শঙ্খচিল ভাসছে। এক-একদিন রাতে স্বপ্নের ভিতর সেও অমন ভেসে পড়ে। ঘোলপুকুরে গাব গাছের উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে বড়োদিঘিতে। সিধে জলে না পড়ে সে পাখির মতো ভাসছে। ডানার বদলে দুই হাতে বাতাস কেটে। বাতাস যেন জল। পিছনে দু-পা ঠেলে দিয়ে আরও এগিয়ে যাচ্ছে। উঁচুতে। আরও উঁচুতে। অনেকটা ওই শঙ্খচিলদের মতোই।

এই শংকর। শংকর—

চমকে উঠল ছেলেটি। এতক্ষণ যেন সে ক্লাসের বাইরে শঙ্খচিলদের সঙ্গেই আকাশে উড়ছিল। থতোমতো খেয়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ মাস্টারমশাই—

বিভীষণ দাশ প্রায় ভেংচে উঠলেন, হ্যাঁ মাস্টারমশাই! খুব মন পড়াশুনোয়! চোখ কোন দিকে ছিল এতক্ষণ? কী দেখছিলে?

শংকর একদম চুপ। স্কুলের সামনে ধানক্ষেতে রোয়া ধান সবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঘন সবুজ। আর লাইন দিয়ে রোয়া। তার ওপর এইমাত্র একখানা মেঘের ছায়া পড়ল। ছায়া সরে যাচ্ছে। আর সেখানে রোদ এসে ঢুকছে।

বিভীষণ দাশ চটে গিয়ে বললেন, কী দেখছিলে বাইরে?

শংকর ঘাবড়ে গেল। শঙ্খচিল মাস্টারমশাই—আকাশে—

ওঃ! শঙ্খচিল! আমি কী পড়াচ্ছি বলো তো?

এমু কথাটা একবার তার কানে ঢুকেছিল। শংকর তাই বুক ঠুকে বলছিল, এমু পাখি মাস্টারমশাই—

এমু পাখি দেখেছ কখনও?

হ্যাঁ মাস্‌সাই—।

এদিকে সবাই মাস্টারমশাই কথাটা তাড়াতাড়িতে বলে মাস্‌সাই।

কোথায় দেখলে?

ঘোলপুকুরে বড়োদিঘির পাড়ে — সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল।

সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল! কেমন দেখতে সে এমু পাখি?

শংকর বুঝল, কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাই মাস্‌সাইয়ের কথায় ঠাট্টার সুর। তবু তার যেমন মনে পড়ল তেমনই সে বলল, খুব গাঢ় ছাই রং মাস্‌সাই। বাজপাখির চেয়েও বড়ো—চওড়া বুক—উড়ে গেলে ডানায় বাতাস কাটার শব্দ হয় জোরে—এমনি অন্য পাখিরা তখন ভয়ে সরে যায়।

ভয়ে সরে যায়? বলি এটা কি পঞ্চানন অপেরা পেয়েছ? বানিয়ে বানিয়ে যে পার্ট বলে যাচ্ছ খুব!

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। বিভীষণ দাশ কড়া মাস্টারমশাই। গম্ভীর গলায় বললেন, এমু পাখির বাসস্থান আন্ডিজ পর্বতমালা। তিন বছরে একবার মোটে দুটো করে বড়ো বড়ো ডিম পাড়ে। সে কোন দুঃখে অত দূর দেশ থেকে ঘোলপুকুরের বড়োদিঘির পাড়ে সবেদা গাছের ডালে এসে বসবে? অ্যাঁ? আর এমু হলো গিয়ে দৌড়বাজ পাখি। খুব দৌড়ায়। উড়তেই পারে না। ঘোলপুকুরে তুমি এমু পেলে কোত্থেকে? বলো। বলতেই হবে—

শংকর মুষড়ে পড়ল। কিন্তু তার মনে হচ্ছে — সে দেখেছে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই ফিক ফিক করে হাসছে। কোথায় দেখেছে? দেখে থাকতে পারে? তবে কি প্রকৃতিবিজ্ঞান বইয়ের ছবিতে দেখল। না। তাহলে? সাহস করে বলল, বলব মাস্‌সাই?

বলো।

তাহলে স্বপ্নে একদিন দেখেছি মাস্‌সাই। বেশ বড়ো সাইজের পাখি।

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি থামাতে বিভীষণ দাশ বললেন, স্বপ্নে দেখেছ?

হ্যাঁ মাস্‌সাই। নইলে আর কোথায় দেখব? আপনি তো বললেন এমু পাখি থাকে আন্ডিজ পাহাড়ে। সে পাহাড় কোথায় আমি জানি না। স্বপ্নে আরও অনেক রকমের পাখি আসে মাস্‌সাই—

চুপ! —বলে ধমকে উঠলেন বিভীষণ দাশ। তোমার বাবার নাম কী?

আজ্ঞে অভিমন্যু সেনাপতি।

তাকে আসতে বলবে কাল। আমি কথা বলব।

বাবা তো আসতে পারবে না মাস্‌সাই—

কেন?

বাবার খুব অসুখ।

এমন সময় সেকেন্ড বেঞ্চ থেকে সমীরকান্ত দীক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে হাসি চাপতে চাপতে বলল, ওর খুব পেট গরম মাস্‌সাই—তাই রোজ স্বপ্ন দেখে—

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বিভীষণ দাশ জানতে চাইলেন, পেট গরম কেন?

গাছে গাছেই সারাদিন থাকে। গাব, জাম, নোনা, ডাব খেয়ে খেয়ে বেড়ায়। পেট গরম হবে না তো কী।

শংকর সেনাপতি আর বিশেষ কিছু বলতে পারল না। কী কুক্ষণেই যে সে ওদের স্বপ্নের কথা বলেছিল।

স্বপ্ন তো সে সত্যিই দেখে। রোজই প্রায় দেখে। সেসব স্বপ্নে সে ওড়ে। পাখি হয়ে। আবার ধপ করে স্বপ্নের ভিতর সে খাট থেকে পড়েও যায়। পড়ে গিয়ে ঘুম ভাঙলে টের পায়—না, সে পড়েনি। বাঁ পায়ের শিরায় টান ধরেছে।

স্বপ্নেই সে এমু পাখি দেখে থাকবে। গাঢ় ছাই রঙের বিরাট এক পাখি। ঘোলপুকুরে দিঘির পাড়ে সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল। অনেকটা বাজপাখির মতো। তবে তার চেয়েও বড়ো। দূর থেকে কাকের দল চেঁচাচ্ছিল। পাখিটা উড়ে যেতে ডানায় বাতাস কাটার শব্দ হয়েছিল। অথচ বিভীষণ মাস্‌সাই বলছেন — এমু উড়তে পারে না— দৌড়োয়—দৌড়বাজ পাখি তো!

জেগে থাকতে দেখা আর স্বপ্নে দেখা জিনিস আজকাল শংকরের গুলিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের দেখাকে মনে হয় জেগে থাকতে দেখেছি। জেগে থাকতে দেখা জিনিস মনে হয় স্বপ্নে দেখেছি।

হঠাৎ বিভীষণ মাস্সাই চিৎকার করে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।

সঙ্গে সঙ্গে শংকর বসে পড়ল। সে তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে কখনও বলবে না। বিশ্বাস করে বলার ফল তো এই। স্বপ্নে সে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। যেমন স্বপ্নের বাতাসের রং নীলচে। বাড়ি-ঘরদোর খয়েরি রঙের। স্বপ্নে ধাক্কা খেলে কিংবা গুঁতো খেলে কোনো ব্যথাই লাগে না। অনেকটা যেন ঘোলপুকুরে বড়োদিঘিতে ডুব দিয়ে মাটি তোলার পর ভেসে ওঠার মতো। আপসে ভুস করে ভেসে ওঠা। জলের নীচে পোঁতা বাঁশে গা ঘষে গেলেও টের পাওয়া যায় না।

বিভীষণ মাস্টারমশাই বলছিলেন, পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে— তখন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলবে— যেন পায়ের শব্দ না হয়। জামাকাপড়ের রং শুকনো পাতার রং বা জলপাই রঙের হলে ভালো। এই রং গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থাকে। বেগুনি রঙের জামা পরলেও ভালো—পাখিরা বেগুনি রং দেখতে পায় না।

তন্ময় হয়ে শুনছিল শংকর। হঠাৎ মাস্টারমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, শংকর সেনাপতি—

হ্যাঁ মাস্‌সাই বলে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল শংকর।

তুমি তো গাছে গাছে ঘোরো—

একগাল হেসে ফেলল শংকর। তা মাস্‌সাই—

তুমি তো অনেকরকম পাখি দ্যাখো। তাদের কথা বলতে পারো?

বিভীষণ মাস্‌সাই যে তাকে এমন একটা কথা বলবেন—তা ভাবতে পারেনি শংকর। সে লজ্জার সঙ্গে বলল, মাছরাঙা—

আর?

হাঁড়িচাচা। ডৌখোল। পানকৌড়ি। তিতির মাস্‌সাই—

বাঃ! যত পারবে চোখ খোলা রেখে এই পৃথিবীর পাখি, গাছপালা, মেঘ, আলো — সব দেখে নেবে।

শংকরের বুকটা গর্বে ফুলে উঠল।

বিভীষণ মাস্টারমশাই বললেন, এই খোলামেলা পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো বই। তাকে চোখ ভরে দেখাই সবচেয়ে বড়ো পড়াশুনো।

হাতে কলমে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩—২০০১) : জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশের খুলনা। বহুবিচিত্র জীবিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই সাংবাদিক-লেখকের সব রচনাতেই সেই বিচিত্রতার স্বাদ পাওয়া যায়। বহু সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত এই লেখক ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *শাহাজাদা দারাশুকো* উপন্যাসের জন্য *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে — *বেঁচে থাকার স্বাদ, ভাস্কো দা গামার ভাইপো, মনে কি পড়ে, কুবেরের বিষয়আশয়, ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক।* বর্তমান রচনাংশটি তাঁর *সেনাপতি শংকর* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন বইয়ের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ আকন্দবাড়ি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন জায়গা থেকে পড়তে আসে?

২.২ স্কুলের জানলা থেকে কী কী দেখা যায়?

২.৩ শঙ্কর কীসের স্বপ্ন দেখে?

২.৪ শঙ্করের স্বপ্নে বাতাসের রং কী?

২.৫ এমু ছাড়া উড়তে পারে না শুধু দৌড়তে পারে এমন একটি পাখির নাম লেখো।

৩. **গল্প থেকে একই অর্থযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

বিদ্যালয়, অনিল, জগৎ, একাগ্র-চিত্ত, পাখা, রোপণ করা।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :** ভিজে, রাত, বাইরে, গাঢ়, বিশ্বাস।

৫. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** বঙ্গোপসাগর, তন্ময়, সাবধান, ত্রিশেক, পঞ্চানন।

৬. **নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ তা খুঁজে নিয়ে আলাদা দুটি স্তম্ভে সাজাও। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :**

প্রকৃতি, ব্যথা, মাটি, বিশ্বাস, জল, মাঠ, শব্দ।

৭. **সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্যে প্রয়োগ করো :**

ভাষা—	পড়ে—	শংকর—	মাথা—	বাঁশ—
ভাসা—	পরে—	সংকর—	মাতা —	বাস—

৮. গল্পে বেশ কিছু পাখি ও গাছের নাম আছে। এই পাখি ও গাছের নামের তালিকা তৈরি করে এগুলি সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে নামের পাশে পাশে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নাও। এগুলি ছাড়াও তোমার জানা আরও কিছু পাখি আর গাছের নাম, তাদের বৈশিষ্ট্য লিখে নীচের ছকটি পূরণ করো।

পাখির নাম	আকার	রং	ঠোঁট	লেজ	পা	ঝুঁটি
দুর্গা টুনটুনি	ছোটো	বেগুনি	সরু, লম্বা, বাঁকানো	ছোটো	সরু, লম্বা	নেই

গাছের নাম	আকার	কী জাতীয়	পাতাগুলো কেমন	ফুল	ফল	কোথায় দেখেছ

৯. **নীচে কতগুলি উপসর্গ দেওয়া হলো। গল্প থেকে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে এই উপসর্গগুলি যুক্ত করে কয়েকটি নতুন শব্দ তৈরি করো :**

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ
বি		
প্র		
নি		
সু		
আ		

১০. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ খুঁজে বের করো :**

১০.১ পাঁচ সাত মাইলের ভেতর বঙ্গোপসাগর।

১০.২ জনা ত্রিশেক ছেলেমেয়ে বসে।

১০.৩ সেদিকে তাকিয়ে একটি ছেলে আনমনা হয়ে পড়েছিল।

১০.৪ এক একদিন রাতে স্বপ্নের ভেতর সেও অমন ভেসে পড়ে।

শব্দার্থ : রোয়া — রোপণ করা। ঘাবড়ে — থতোমতো খাওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। মুষড়ে — হতাশ হয়ে। তন্ময় — একমনা। গর্ব — অহংকার।

১১. নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বার করো। প্রতিটি বাক্যের ভিতর যেসব শব্দ আছে তাদের সঙ্গে কী কী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে দেখাও।

১১.১ এখানে বাতাসের ভেতর সবসময় ভিজে জলের ঝাপটা থাকে।

১১.২ মাটির মেঝে।

১১.৩ সেই জানলা দিয়ে মেঘ দেখা যায় আকাশের।

১১.৪ স্বপ্নের ভেতর সে খাট থেকে পড়েও যায়।

১১.৫ সে তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে কখনও বলবে না।

১২. নীচের বাক্যগুলি থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ খুঁজে নিয়ে লেখো :

১২.১ আকন্দবাড়ি স্কুলের ক্লাস ফাইভে বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলছিলেন।

১২.২ স্কুলের সামনে ধানক্ষেতে রোয়া ধান সবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

১২.৩ গাঢ় ছাইরঙের বিরাট এক পাখি।

১২.৪ তন্ময় হয়ে শুনছিল শংকর।

১২.৫ এই খোলামেলা পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো বই।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১৩. 'কথা', 'চোখ' — এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো।

১৪. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সরল, কোনটি জটিল ও কোনটি যৌগিক বাক্য তা খুঁজে নিয়ে লেখো :

১৪.১ জানলায় কোনো শিক নেই।

১৪.২ জেগে থাকতে দেখা আর স্বপ্নে দেখা জিনিস আজকাল শংকরের গুলিয়ে যাচ্ছে।

১৪.৩ পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে-তখন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলবে।

১৪.৪ বিভীষণ মাস্সাই যে তাকে এমন একটা কথা বলবেন তা ভাবতে পারেনি শংকর।

১৫. নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করে একটি অনুচ্ছেদের রূপ দাও :

গুঁড়ো, প্রকৃতি, জানলা, ডানা, ছায়া, শব্দ, স্বপ্ন, খোলামেলা।

এভাবে শুরু করতে পারো :

বাইরে হাওয়ায় বৃষ্টির গুঁড়ো উড়ে বেড়াচ্ছে। জানলা দিয়ে একমনে তাকিয়ে দেখছে ঝিমলি। প্রকৃতি যেন রোজ নতুন নতুন সাজে এসে হাজির হয়। গাছে বসা সবুজ টিয়ার ডানায় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু জল। ...

১৬. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১৬.১ ‘পাগলা বাতাসে তার ঢেউয়ের গুঁড়ো সবসময়ে উড়ে আসছে’ —এখানে বাতাসকে ‘পাগলা’ বলা হলো কেন?

১৬.২ ‘বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলেছিলেন।’ —গল্পের ‘বিভীষণ দাশ’-এর পরিচয় দাও। এমু পাখি ছাড়া গল্পে আর কোন পাখির প্রসঙ্গ এসেছে?

১৬.৩ ‘শংকর বুঝল, কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে।’ —কে এই শংকর? তার স্বভাবের প্রকৃতি কেমন? তার যে কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে —এটা সে কীভাবে বুঝতে পারল?

১৬.৪ এমু পাখির যে বর্ণনা শংকর দিয়েছিল তার সঙ্গে পাখিটির মিল বা অমিল কি লেখো।

১৬.৫ ‘এটা কি পঞ্চানন অপেরা পেয়েছ?’ — ‘অপেরা’ বলতে কী বোঝ? এখানে অপেরার প্রসঙ্গ এল কেন?

১৬.৬ ‘বলো, বলতেই হবে’— কাকে একথা বলা হলো? উদ্দিষ্টকে কোন কথা বলতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছে?

১৬.৭ গল্প অনুসরণে আকন্দবাড়ি স্কুলে সে প্রকৃতিবিজ্ঞান ক্লাসে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিজের ভাষায় লেখো।

১৬.৮ ‘স্বপ্নে সে অনেক কিছু জানতে পেরেছে।’ —কার স্বপ্ন দেখার কথা বলা হয়েছে? স্বপ্ন দেখে সে কী জেনেছে ?

১৬.৯ ‘পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে’ —তখন কীভাবে চলতে হবে?

১৬.১০ ‘তাদের কথা বলতে পারো?’ —এই প্রশ্নের সূত্র ধরে বক্তা-শ্রোতার কথোপকথনের অংশটুকু নিজের ভাষায় লেখো।

মিলিয়ে পড়ো

আগের গল্পে প্রকৃতি থেকে শেখার কথা তোমরা পড়লে। স্কুলের বাইরে প্রকৃতির কাছে থেকে কী কী শেখা যায় লেখাটি পড়ে দেখো।

খোলামেলা দিনগুলি

শান্তিসুধা ঘোষ

মহানগরীর হট্টগোল থেকে দূরে এসে, বাঁধাধরা স্কুলজীবনের ছককাটা জীবনযাত্রার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বরিশালের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকৃতি যেন আমার চারপাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এল। বাবাকে শৈশবাবধি দেখেছি প্রকৃতির পূজারি। শুধু কাব্য বা দর্শনে নয়, মাটির ধূলার সঙ্গে তাঁর একান্ত প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা। নিজের হাতে খুরপি সহযোগে মাটি তৈরি করে, জলের ঝারি হাতে পুকুর থেকে জল তুলে চারাগাছগুলিতে সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত জলসেচন দ্বারা ফুলের বাগানে ও ফসলের ক্ষেতে কী অপূর্ব সুন্দর করেই না আমাদের বাড়িখানা তিনি সাজিয়েছিলেন। সেই অনুরাগ বোধহয় আমাদেরও রক্তের ধারায় বয়ে এসেছে। সে আজ অবকাশ পেয়ে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল যেন। সভ্যতার দমবন্ধ করা অবরোধ এখানে এসে যেন একবারে হালকা হয়ে গেছে। এখানে শুধুই খোলা দরজার আহ্বান। আর কচিপাতার ও দূর্বাঘাসের শ্যামলিমায়, ফুলের হাসিতে ও পাখির গানে, সেই উন্মুক্ত অবকাশগুলি নিরন্তর পূর্ণ হয়ে উঠছে। —দক্ষিণের দরজার পাশেই ছোটো একটুকরো বাগান, সেখানে

শিউলি, গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গাছ সৌরভ ছড়ায়, তার মাঝখানে একটি বসোরা গোলাপের চারা। একটি স্তবকে দুটি গোলাপ ফুল ফুটেছিল সেদিন, আমি দোর খুলেই থমকে দাঁড়ালাম, সকল সত্তা যেন আটকে গেল ওই স্তবকে, আমি দেখতেই লাগলাম, দেখা আর ফুরোয় না। —আমাদের আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ির মাঝখানে যে নালাটি বাইরের খাল-নদীর জল বহন করে বর্ষার মরশুমে পুকুরে এনে ফেলে, সেখানে অনেক বড়ো বড়ো শিঙি, মাগুর মাছের আনাগোনা। বাবা প্রায়ই সেখানে ছিপ ফেলে বসেন। আমি অনেক সময় গিয়ে দাঁড়াই। পাশে একটি 'গনিয়ারি' গাছ ও একটি ঝুমকো জবার গাছ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুমকো গাছটি রাশি রাশি লাল ফুলে ভরা। চোখ আকর্ষণ করে নেয় তাদের সুষমা, তাদের সোহাগ বন্ধন—রাধাকৃষ্ণ যেন। —বাড়ির চাকর আনন্দ যখন দেশে যায়, তখন প্রাতরাশের পর বাসনপত্র নিয়ে খিড়কির পুকুরঘাটে মাজতে যাই, আর দেখতে থাকি, পুকুরের শান্ত জল, রক্তশাপলা ও শ্বেতশাপলার ফুলে ফুলে কী অপূর্ব শোভায় সেজেছে। আয়নার মতো স্বচ্ছ তার জলরাশি, মুখ নীচু করে তাকিয়ে দেখি, শাপলার বৃন্তগুলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে গেছে। কোন অতলে পৌঁছেছে? সে কি রূপবতী রাজকন্যার পাতালপুরীতে? নিজের মুখখানার প্রতিবিম্ব জলে ভেসে উঠল— চমকে ভাবলাম, এই কি সেই রাজকন্যা? শরীরে পুলক জাগে, মনে নেমে আসে স্বপ্নাবেশ।

পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি

হাইনরিখ্ হাইনে

উত্তরে বুনো নগ্ন পাহাড় 'পরে,
দাঁড়ায়ে পাইন আকাশে নয়ন তুলে,
যেন বরফের রূপালি কাপড় প'রে,
স্বপ্ন সে দেখে দিনরাত দুলে দুলে।

স্বপ্ন সে দেখে দূরে মরুভূমি প'রে
সেই দেশে যেথা প্রভাতে সূর্য ওঠে,
তপ্ত পাহাড়ে বেদনায় বুক ভ'রে
দাঁড়ায়ে রয়েছে পামগাছ মরুতটে।

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হা
তে
ক
ল
মে

হাইনরিখ্ হাইনে (১৭৯৭—১৮৫৬) : জন্ম জার্মানির রাইন নদীর তীরে ড্যুসেলডর্ফ-এ। উনবিংশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট জার্মান কবি। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তবে গীতিকবি হিসেবেই তিনি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছেন। ১৮১৭ সালে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয় *হার্ৎস্‌রাইজে* (*Harzreise*) বা *হার্ৎস যাত্রা*। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত কাব্যগীতিগ্রন্থ (*Buch der Lieder*) *উত্তর সাগরগীতিকা* তাঁকে বিশ্বজনীন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। এ ছাড়াও *নতুন কবিতা, জার্মানি: এক শীতের রূপকথা* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং *ফরাসি পরিস্থিতি, রোমান্টিক কাব্যধারা, ধর্মের ইতিহাস* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলোচনাগ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গীতিকবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে।

১.১ কবি হাইনরিখ্ হাইনের জন্মস্থান কোথায়?

১.২ কবি হাইনে-র লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.৩ কবি হাইনে-র লেখা দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **ঠিক উত্তরের উপরে '✓' দাও:**

২.১ (উত্তরে/দক্ষিণে/পশ্চিমে) বুনো নগ্ন পাহাড়ে পাইন দাঁড়িয়ে।

২.২ যেন বরফের (সোনালি/রূপালি/সব্‌জে) কাপড় পরে...।

২.৩ মরুতটে দাঁড়িয়ে রয়েছে (পাইন/পাম/খেজুর) গাছ।

২.৪ জার্মান ভাষায় কবিতা লেখেননি (গোয়ঠে/রিলকে/শেক্সপিয়র)।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ পাইন গাছ সাধারণত কোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়?

৩.২ পাইন গাছ কী ধরনের পোশাক পরে আছে বলে কবির মনে হয়েছে?

৩.৩ পাম গাছ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

৩.৪ পাইন গাছ কীভাবে স্বপ্ন দেখে?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ পাম গাছের বুক বেদনায় ভরা কেন?

৪.২ পাইন গাছ কী স্বপ্ন দেখে?

৪.৩ বরফের দেশের পাইনগাছ, মরুভূমির পাম গাছের স্বপ্ন দেখে কেন?

শব্দার্থ: নগ্ন পাহাড় --- গাছপালাহীন (ন্যাড়া) পাহাড়। তপ্ত --- গরম। বুনো --- বন্য। প্রভাত — ভোরবেলা। বেদনা — ব্যথা, কষ্ট।

৫. **‘মরুভূমি’ ও ‘মরুতট’ শব্দ দুটি লক্ষ করো :**

মরু + ভূমি —— মরুভূমি

মরু + তট —— মরুতট

একইভাবে ‘সূর্য’ ও ‘নয়ন’-এর সঙ্গে একাধিক শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো।

৬. সমগ্র কবিতাটির মধ্যে কতগুলি বিশেষণ খুঁজে পাও লেখো।

৭. **নানারকম গাছের নাম লিখে নীচের ছকটি পূরণ করো:**

পার্বত্য অঞ্চল	মরুভূমি অঞ্চল
পাইন,	পাম,

৮. পার্বত্য অঞ্চল ও মরুভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতে তুমি নীচের মানস মানচিত্রে কী কী শব্দ ব্যবহার করবে? তুমি এর মধ্যে যে কোনো একটিতে মানস অভিযানে গেলে কী কী জিনিস সঙ্গে নেবে? সেই অভিযানের কাল্পনিক বিবরণ কয়েকটি বাক্যে লেখো।

আকাশভরা সূর্য-তারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে।

মন-ভালো-করা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?
হ্রস্ব দীর্ঘ নীল-নীলান্ত
কেন ওর রং খর ও শান্ত,
লাল হরিদ্রা সবুজাভ বন?
মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?
মাছরাঙাটির গায়ে আলো পড়ে
হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে,
মাছরাঙাটির গায়ে হাওয়া পড়ে।
মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য*। এছাড়াও *ধর্মে আছি জিরাফেও আছি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, সোনার মাছি খুন করেছি, যেতে পারি কিন্তু কেন যাব* উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। *কুয়োতলা, অবনী বাড়ি আছো?* বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি *আনন্দ* পুরস্কার এবং *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছেন।

১.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায় কোন কলেজের ছাত্র ছিলেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :** হ্রস্ব, খর, শান্ত।

৩. **নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে লেখো :** রোদ্দুর, গা।

৪. 'হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে' — হাওয়া-বাতাসের মতো একই অর্থবোধক পাঁচটি শব্দবন্ধ রচনা করে স্বাধীন বাক্যে প্রয়োগ করো।

৫. 'মন-ভালো-করা,' 'নীল-নীলান্ত'র মতো একাধিক শব্দবন্ধ তৈরি করো।

শব্দার্থ : হ্রস্ব — ছোট, ক্ষুদ্র। হরিদ্রা — হলুদ। খর — তীব্র।

৬. **গদ্যে লেখো :**

'মন-ভালো-করা-রোদ্দুর কেন / মাছরাঙাটির গায়ের মতন?'

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ কবিতায় কবিমনে কোন কোন প্রশ্ন জেগেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৭.২ মন-ভালো-করা রোদ্দুরকে কবি কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

৭.৩ মাছরাঙা পাখির রং কবির চোখে কীভাবে ধরা পড়েছে?

৭.৪ গাছের ডালে বসা মাছরাঙা পাখিটি কীভাবে কবিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে তা বুঝিয়ে দাও।

মিলিয়ে পড়ো

মাছরাঙা পাখির কথা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পড়লে। এবার পড়ো মাছ খেতে ভালোবাসে যে ‘মেনি’, তার কথা।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মেনিটাকে দেখছি না কই তো !
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে   লাভ নাই কিছু রেখে,
রাখা দায় ঘরে দুধ-দই তো !

সব বাড়ি সব ঠাঁই গতি যে,
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে—
ছেলেদের বিছানায়   আরামেতে ঘুম যায়
করে নাকো উৎপাত বই তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু,
তবু কী আকর্ষণ   বুঝিতে পারে না মন,
ছেড়ে দিতে চায় নাকো কিন্তু।

চলে গেল গোটা দিন রাত রে,
আঁখি তারে ফিরিতেছে হাতড়ে,
কোথা গেল পথ ভুলো   কাঁদিতেছে ছেলেগুলো,—
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো।

পশুপাখির ভাষা

সুবিনয় রায়চৌধুরী

'পশুপাখির কি ভাষা আছে? তারা কি মনের ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে? পরস্পরকে বুঝাবার জন্য তারা কি কোনো ভাষা ব্যবহার করে?' — এইসব প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল থেকেই জেগেছে এবং এই বিষয়ে নানারকমের পরীক্ষা বহুকাল থেকে হয়ে আসছে।

পশুপাখিরা অবিশ্যি মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে। বুদ্ধিমান জীব — যেমন কুকুর, বনমানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি — তাদের মানুষে-দেওয়া নাম শুনলেই কান খাড়া করে; — নাম ধরে ডাক দিলে কাছে আসে। মুরগিরা 'তি-তি' ডাক শুনে আসে, হাঁস 'সোই-সোই' ডাক শুনে আসে, ছাগল 'অ-র্-র্' ডাক শুনে আসে। হাতি তো মাহুতের কথা শুনেই চলে। মাহুতের ভাষায় (পূর্ববঙ্গের) 'বৈঠ' হচ্ছে 'বস', 'তেরে' মানে কাত হও, 'ভোরি' মানে 'পিছনে যাও', 'মাইল' মানে সাবধান ইত্যাদি। কুকুরেরাও কথা শুনে হুকুম পালন করতে ওস্তাদ;— অবিশ্যি, সে-সব কথার অর্থ তাদের শেখাতে হয়।

পশুরা মানুষের ভাষা কিছুকিছু বোঝে বটে; কিন্তু, সে ভাষা তো তারা বলতে পারে না; পরস্পরকেও সে ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় জানে না তারা। তাদের মুখের কয়েকটি বিশেষ শব্দ যে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বেড়াল বা কুকুর ঝগড়া করার সময় যে শব্দ করে, কান্নার সময় সে শব্দ করে না। দূর থেকে শুনেই বোঝা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে। কুকুরের ঝগড়া আর রাগের শব্দে 'ঘেউ' আছে; ভয় বা কান্নার শব্দে 'কেঁউ' আছে। জাতভেদে শব্দের টানে আর গাম্ভীর্যে যা একটু তফাত। বেড়ালেরও তেমনি সাধারণ আওয়াজে 'ম্যাও', 'মিউ' ইত্যাদি আছে; রাগ বা ঝগড়ায় 'ওয়াও' আছে। দূর থেকে শব্দ শুনেই বোঝা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে। কী শুধু আওয়াজ

করছে— অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছে। অনেক পশুই এই ধরনের শব্দ করে থাকে। পাখিরাও ভয়, রাগ প্রভৃতি প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। বিপদের সময় পরস্পরকে জানাবার উপায়ও পশুপাখিরা বেশ জানে।

রিউবেন ক্যাস্টাং নামে একজন সাহেব বহুকাল পশুদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি পশুর ভাষা বেশ বুঝি। কতবার আমি জংলি হাতির সামনে পড়েছি, বাঘের গরম নিশ্বাস অনুভব করেছি, প্রকাণ্ড ভাল্লুকের থাবা মুখের সামনে দেখেছি, গরিলা প্রায় জড়িয়ে ধরে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু একটি জিনিস প্রত্যেকবারই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, — সেটি হচ্ছে, পশুদের ভাষার জ্ঞান। আমি পশুদের ভাষা কিছুকিছু জানি বলেই এতবার সাক্ষাৎ যমকে এড়িয়ে যেতে পেরেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'সিংহকে যদি তারই ভাষায় বলতে পারো, তুমি তার বন্ধু, তাহলে অনেকটা নিরাপদ হবে। তারপর যদি তাদের জাতের আদবকায়দা অনুসারে তার কাছে যেতে পারো, তাহলে ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ থাকবে না।'

ক্যাস্টাং সাহেব প্রায় চল্লিশ বছর বন্যজন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন। খাঁচার এবং জঙ্গলের,— অর্থাৎ পোষা এবং বুনো এই দুই অবস্থার জন্তুদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ের নানা সুযোগ ঘটেছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, সিংহ, গ্রিজ্‌লি ভাল্লুক আর শ্বেত ভাল্লুক।

তিনি বলেন, 'এইসব পশুর গলার শব্দের অবিকল নকল করার ক্ষমতা থাকায় শুধু যে বহুবার আমার প্রাণ বেঁচেছে, তা নয়; এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবারও অনেক সুবিধা হয়েছে। পশুরা শুধু শব্দের

সাহায্যে কথা বলে না, নানারকম ইশারায়ও বলে। কুকুরের লেজনাড়া আর কান নাড়ার মধ্যে কত অর্থ আছে, তা অনেকেই আমরা জানি। একেও ভাষা বলতে হবে।'

পোষা জন্তুরা নাকি জঙ্গলের জন্তুদের থেকে অনেক বেশি চেঁচামেচি করে। পোষা কুকুর আর ঘোড়া কত চেঁচায়! কিন্তু জংলি কুকুর বা ঘোড়ার শব্দ বড়ো একটা শোনা যায় না। জঙ্গলের পশুকে সর্বদাই প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হয়, তাই তারা স্বভাবতই নীরব।

পশুর মধ্যে শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং জাতীয় বনমানুষের ভাষা বিশেষ কিছু নাই। বানরের মধ্যে কয়েক জাতীয় বড়ো বানর ছাড়া অন্য সকলের ভাষার শব্দ অতি সামান্যই। ক্যাস্টাং সাহেব এইসব ভাষা নিয়ে বহু বৎসর গবেষণা করেছেন।

তিনি বলেন, ভালো করে লক্ষ করলে পশুদের মনের বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যায়। এইসব আওয়াজের অবিকল নকল করতে শিখলে পশুদের সঙ্গে ভাব পাতাবারও সুবিধা হয়।

ক্যাস্টাং সাহেব বলেন, হাতি, সিংহ, বাঘ আর শ্বেত ভাল্লুকের কয়েকটির গায়ে হাত দেওয়ার আগে বিশেষ করে লক্ষ করতে হবে, তোমার আওয়াজের জবাব সে দিচ্ছে কিনা। তারপর, খুব সাবধানে, অত্যন্ত ধীরে এগিয়ে, মেজাজ বুঝে, তার গায়ে হাত দিতে হবে। বাঘের চেয়ে চিতা ঢের সহজে ভাব পাতায় আর পোষও মানে। তার মুখটি দেখলেই অনেকটা বেড়াল-বেড়াল ভাব মনে আসে।

ভাল্লুক নিরামিষাশী আর লোভী; তাকে খাবার দিলেই সে সহজে ভাব পাতায়। আমিষাশী জন্তু কিন্তু কখনও খাবারের লোভে ভাব করে না। খাবার সময় তার কারো সঙ্গে ভাব নাই; — তখন সকলকেই অবিশ্বাস।

শিম্পাঞ্জি, ওরাং এদের বিষয় কিছু লেখা হয়নি। এরা তো মানুষেরই জাতভাই; কিন্তু ভাষা এদের বড়ো একটা নাই। ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি এরা খুব বোঝে; ভাবও পাতায় সহজেই। এদের মনের ভাবই মুখে বেশি প্রকাশ পায়। গরিলাও এদের জাতভাই; সেও অনেকটা এদের মতো; তবে একটু কম চালাক।

হাতেকলমে

সুবিনয় রায়চৌধুরী (১৮৯০—১৯৪৫) : প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। তিনি হারমোনিয়াম, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। সংগীতে তাঁর জ্ঞান ছিল সুবিদিত। তিনি একান্তভাবে ছোটোদের জন্যই লিখেছেন। একদিকে সহজ-সরল ভাষায় মজাদার গল্প-কবিতা যেমন লিখেছেন অজস্র, ঠিক তেমনই শিশু-কিশোর মনের জিজ্ঞাসা মেটাতে প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধও রচনা করেছেন। *সন্দেশ* পত্রিকায় তাঁর বিপুল অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই *সুবিনয় রায়চৌধুরীর রচনা সংগ্রহ*।

১.১ সুবিনয় রায়চৌধুরী কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন?

১.২ সুবিনয় রায়চৌধুরী কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. কোনটি কার ডাক মিলিয়ে লেখো:

ব্যাঙের ডাক	কাকলি
হাতির ডাক	হ্রেষা
পাখির ডাক	বৃংহণ
কোকিলের ডাক	মকমকি
ঘোড়ার ডাক	কেকা
ময়ূরের ডাক	কুহু

শব্দার্থ : সাক্ষাৎ — প্রত্যক্ষ করা/দেখা হওয়া। আদবকায়দা — ভদ্রতার রীতিনীতি। নিরামিষাশী — নিরামিষ খাদ্য আহার করে যে। মাংসাশী — আমিষ খাদ্য আহার করে যে। সহানুভূতি — সমবেদনা।

৩. নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :

পশু, মুখ, মন, পরীক্ষা, চালাক, অর্থ, লোভ, জন্তু, মেজাজ।

৪. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে দেখাও :

৪.১ মুরগিরা 'তি-তি' ডাক শুনে আসে।

৪.২ পাখিরাও ভয়, রাগ প্রভৃতি প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।

৪.৩ ক্যাস্টাং সাহেব প্রায় চল্লিশ বছর বন্য জন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন।

৪.৪ শিম্পাঞ্জি, ওরাং এদের বিষয় কিছু লেখা হয়নি।

৫. **প্রতিশব্দ লেখো :** পাখি, পুকুর, হাতি, সিংহ, বাঘ।

৬. **নীচের যে শব্দগুলিতে এক বা বহু বোঝাচ্ছে, তা চিহ্নিত করে লেখো :**

৬.১ কুকুরেরাও কথা শুনে হুকুম পালন করতে ওস্তাদ।

৬.২ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

৬.৩ বিপদের সময় পরস্পরকে জানাবার উপায়ও পশুপাখিরা বেশ জানে।

৬.৪ রিউবেন ক্যাস্টাং নামে একজন সাহেব বহুকাল পশুদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বেড়িয়েছেন।

৬.৫ একেও ভাষা বলতে হবে।

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৭.১ ভাষার প্রয়োজন হয় কেন?

৭.২ 'পশুপাখিরা অবিশ্যি মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে।' —একথার সমর্থনে রচনাটিতে কোন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে? তুমি এর সঙ্গে আর কী কী যোগ করতে চাইবে?

৭.৩ রিউবেন ক্যাস্টাং এর অভিজ্ঞতার কথা পাঠ্যাংশে কীভাবে স্থান পেয়েছে, তা আলোচনা করো।

৭.৪ 'একেও ভাষা বলতে হবে।' — কাকে 'ভাষা'র মর্যাদা দিতে হবে বলে বক্তা মনে করেন? তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত? বুঝিয়ে লেখো।

৭.৫ 'তাই তারা স্বভাবতই নীরব' — কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের এই স্বভাবগত 'নীরবতা'র কারণ কী?

৭.৬ 'এরা তো মানুষেরই জাতভাই।' — কাদের 'মানুষের জাতভাই' বলা হয়েছে? তা সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্যের কথা পাঠ্যাংশে বলা হয়েছে, তা লেখো।

৭.৭ তোমার পরিবেশে থাকা জীবজন্তুর ডাক নিয়ে তুমি একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

৭.৮ এমন একটি গল্প লেখো যেখানে পশুপাখিরা মানুষের সঙ্গে মানুষেরই মতো কথাবার্তা বলেছে আর তাদের মধ্যে অপরূপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

৮. **পাশের ছবিটি দেখে নিজের ভাষায় পাঁচটি বাক্য লেখো :**

ঘাসফড়িং

অরুণ মিত্র

একটা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে,
ভাব না করে পারতামই না আমরা।
ঝিরঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি
অমনি শুরু হয়ে গেল আমাদের নতুন আত্মীয়তা।
সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং,
তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কী মনখারাপ
বলে এলাম আমি আবার আসব,
আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।

এই আবার ঝিরঝির বৃষ্টি
আমি কথা দিয়ে এসেছি
ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

কলমে

অরুণ মিত্র (১৯০৯ —২০০০) : জন্মস্থান বাংলাদেশের যশোহর জেলা। পিতা হীরালাল মিত্র, মাতা যামিনীবালা মিত্র। তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলো — *প্রান্তরেখা, ঘনিষ্ঠ তাপ, শুধু রাতের শব্দ নেই, খুঁজতে খুঁজতে এতদূর, শেষ সরাইখানা, ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে* ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বহু প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদও করেছেন।

১.১ কবি অরুণ মিত্র কোন বিদেশি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে দেখাও :**

২.১ ভাব না করে পারতামই না আমরা।

২.২ সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং।

২.৩ আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।

২.৪ ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৩. **নীচের শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করো :**

ভাব, ভিজে, নতুন, আত্মীয়তা, মনখারাপ, সবুজ, ঝিরঝির।

এভাবে আমরা শুরু করতে পারি : খোলা মাঠের সঙ্গে আমার ভারি ভাব। বিশেষ করে তার উপরে গালচের মতো সবুজ ঘাস যখন ভিজে থাকে। যেন একটা নতুন পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। ...

শব্দার্থ : আত্মীয়তা — কুটুম্বিতা। ঝিরঝির বৃষ্টি — মৃদু বৃষ্টিপাত। ভাব — বন্ধুত্ব।

৪. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

আত্মীয়তা, ঘাস, সবুজ, নতুন।

৫. **নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :**

৫.১ সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং। (যৌগিক বাক্যে)

৫.২ একটা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে। (জটিল বাক্যে)

৫.৩ যেই ঝিরঝির বৃষ্টি থেমেছে অমনি আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি। (সরল বাক্যে)

৫.৪ আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ। (যৌগিক বাক্যে)

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গ খুঁজে নিয়ে লেখো :

৬.১ তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কী মনখারাপ।

৬.২ আমি কথা দিয়ে এসেছি।

৬.৩ ঝিরঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি।

৬.৪ ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

৭. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৭.১ কবির সঙ্গে ঘাসফড়িং-এর নতুন আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠল?

৭.২ কবির কৌতূহল ও ভালোলাগায় ঘাসফড়িং কীভাবে সাড়া দিল বলে তোমার মনে হয়?

৭.৩ ঘাস ফড়িং-এর কাছ থেকে চলে আসার সময় কবির মন খারাপ হলো কেন বুঝিয়ে দাও।

৭.৪ 'বলে এলাম আমি আবার আসব'— পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?

৭.৫ 'আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।'— কবির এরূপ সবুজের সমারোহ দেখার কারণ কী?

৭.৬ 'ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।'— কোন 'ভিজে ঘাসের ওপর' কবিকে ফিরতেই হবে? সেখানে তিনি যেতে চান কেন ?

৭.৭ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নিবিড় টান কীভাবে কবি অরুণ মিত্রের 'ঘাসফড়িং' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে ঘরের আনাচে-কানাচে বা দেয়ালের গায়ে লম্বাটে ধরনের এবড়ো-খেবড়ো এক-একটা শুকনো মাটির ডেলা লেগে থাকতে দেখা যায়। সেগুলি একপ্রকার কালো রঙের লিকলিকে কুমোরে-পোকার বাসা। এই পোকাগুলির গায়ের রং আগাগোড়া মিশমিশে কালো। কেবল শরীরের মধ্যস্থলের বোঁটার মতো সরু অংশটি হলদে। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা বাসা তৈরি করবার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়। দুই-চার দিন ঘুরে-ফিরে মনোমতো কোনো স্থান দেখতে পেলেই তার আশেপাশে বারবার ঘুরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর খানিক দূর উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং স্থানটাকে পুনঃপুনঃ দেখে নেয়। দু-তিনবার এরূপভাবে এদিক-ওদিক উড়ে অবশেষে

কাদামাটির সন্ধানে বের হয়। যতটা সম্ভব নিকটবর্তী স্থানে কাদামাটি সন্ধান করতে সময় সময় দু-একদিন চলে যায়। কাদামাটির সন্ধান পেলেই বাসা নির্মাণের জন্য সেই স্থান থেকে নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা চিনে নেয়। সাধারণত আশেপাশে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ ব্যবধান থেকে মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু অত কাছাকাছি বাসা নির্মাণের উপযোগী মাটি না পেলে সময় সময় দেড়-দুশো গজ দূর থেকেও মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করে বাসার একটা কুঠুরি নির্মাণ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে বা বাসাটা সরিয়ে ফেলে দেখেছি—সংস্কারবশেই হোক আর বুদ্ধি করেই হোক, কুমোরে-পোকাটা বাসার সন্ধান না পেয়ে কোনো একটা জলাশয়ের পাড়ে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ভিজা মাটি সংগ্রহ করে পূর্বের জায়গায় নতুন করে বাসা তৈরি শুরু করেছে। যতবারই এরূপ করেছি, ততবারই দেখেছি — পুকুর বা নালা, ডোবা যত দূরেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই ভিজা মাটি এনে বাসা তৈরি করেছে। এইসব অসুবিধার জন্য অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। একটি কুঠুরি তৈরি হয়ে গেলেই তার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, অর্থাৎ পোকামাকড় ভরতি করে তাতে একটি মাত্র ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করে তারই গা ঘেঁষে নতুন কুঠুরি নির্মাণ শুরু করে। কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে-পোকা ইচ্ছামতো ডিম পাড়বার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাসা নির্মাণের জন্য মাটি সংগ্রহ করবার সময় উড়ে গিয়ে ভিজা মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে দেখে। উপযুক্ত মনে হলেই সেখান থেকে ভিজা মাটি তুলে নিয়ে চোয়ালের সাহয্যে খুব ছোট্ট এক ডেলা মাটি মটরদানার মতো গোল করে মুখে করে উড়ে যায়। মাটি খুঁড়ে তোলবার সময় অতি তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। মুখ দিয়ে চেপে চেপে মাটির ডেলাটিকে দেয়ালের গায়ে অর্ধ-চক্রাকারে বসিয়ে দেয়। মাটির ডেলাটিকে লম্বা করে চেপে বসাবার সময়ও তীক্ষ্ণস্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। কোনো অদৃশ্য স্থানে বাসা বাঁধবার সময়ও এই গুনগুন শব্দ শুনেই বুঝতে পারা যায়, কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধছে। পুকুর ধারে কাদামাটির উপর মাছির মতো একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ঘুরে ঘুরে আহার সংগ্রহ করে। এরূপ স্থলে মাটি তোলবার সময় ওইরূপ কোনো পোকা তার কাছে এসে পড়লে মাটি তোলা বন্ধ রেখে তাকে ছুটে গিয়ে তাড়া করে। যাহোক, বারবার এরূপ এক-এক ডেলা মাটি এনে ভিতরের দিকে ফাঁকা রেখে ক্রমশ উপরের দিকে বাসা গেঁথে তুলতে থাকে। প্রায় সওয়া ইঞ্চি লম্বা হলেই গাঁথুনি ক্ষান্ত করে। এরূপ একটি কুঠুরি তৈরি করতে প্রায় দু-দিন সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে মাটি শুকিয়ে বাসা শক্ত হয়ে যায়। কুমোরে-পোকা তখন কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করে মুখ থেকে একপ্রকার লালা নিঃসৃত করে তার সাহায্যে কুঠুরির ভিতরের দেয়ালে প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে শিকারের অন্বেষণে বের হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সার অভাব নেই; তারা জাল বোনে না, ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে। এই কুমোরে-পোকারা

বেছে বেছে এরূপ ভ্রমণকারী মাকড়সা শিকার করে থাকে। কোনোরকমে মাকড়সা একবার চোখে পড়লেই হলো, ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে। কিন্তু কামড়ে ধরলেও একেবারে মেরে ফেলে না। শরীরে হুল ফুটিয়ে একরকম বিষ ঢেলে দেয়। একবার হুল ফুটিয়ে নিরস্ত হয় না। কোনো কোনো মাকড়সাকে পাঁচ-সাতবার পর্যন্ত হুল ফুটিয়ে থাকে। এর ফলে মাকড়সাটার মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে। তখন কুমোরে-পোকা অসাড় মাকড়সাকে মুখে করে নবনির্মিত কুঠুরির মধ্যে উপস্থিত হয়। কুঠুরির নিম্নদেশে মাকড়সাটাকে চিত করে রেখে তার উদরদেশের এক পাশে লম্বাটে ধরনের একটি ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বের হয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দশ-পনেরোটা মাকড়সা সংগ্রহ করে সেই কুঠুরির মধ্যে জমা করে আবার দু-তিন ডেলা মাটি এনে কুঠুরির মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই পূর্বোক্ত কুঠুরির গায়েই আর একটি কুঠুরি নির্মাণ শুরু করে। সেই কুঠুরিটিও মাকড়সা পূর্ণ করে তাতে ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করবার পর তৃতীয় কুঠুরি নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। এরূপে এক একটি বাসার মধ্যে চার-পাঁচটি কুঠুরি নির্মিত হয়। ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সে তার ইচ্ছামতো যেকোনো স্থানে চলে যায়, বাসার আর কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। বাচ্চাদের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত রেখেই সে খালাস।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫—১৯৮২) : প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্রে তাঁর রচনার মূল উপাদান প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ। জীবজগতের খুঁটিনাটি তথ্য সহজ ভাব ও সরল ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার* পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো — *বাংলার মাকড়সা*, *বাংলার কীটপতঙ্গ* ইত্যাদি।

১.১ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় কী ধরনের লেখালিখির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

২.১ কুমোরে-পোকার চেহারাটি কেমন?

২.২ কুমোরে-পোকা কী দিয়ে বাসা বানায়?

২.৩ কোনো অদৃশ্য স্থানে কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধছে — তা কীভাবে বোঝা যায়?

২.৪ মাকড়সা দেখলেই কুমোরে-পোকা কী করে?

৩. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্য করো :**
লম্বাটে, স্থান, নির্বাচিত, নির্মাণ, সঞ্চিত।

শব্দার্থ : আনাচে-কানাচে — কোনায় কোনায়। পুনঃপুনঃ — বারবার। সংস্কারবশে — প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস অনুসারে। নিয়ন্ত্রণ — আয়ত্ত, পরিচালন। অর্ধ চক্রাকার — আধখানা চাকার আকারবিশিষ্ট। কুঠুরি — ছোটো ঘর বা প্রকোষ্ঠ। গাঁথুনি — পরপর স্থাপিত ইঁট, পাথর ইত্যাদির বিন্যাস। নিঃসৃত — নির্গত। প্রলেপ — লেপন করা হয় এমন বস্তু। নিম্নদেশে — নীচের অঞ্চলে। পূর্বোক্ত — আগে বলা হয়েছে এমন। সঞ্চিত — জমিয়ে রাখা হয়েছে এমন। খালাস — মুক্তি, রেহাই।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বের করো :**

৪.১ বাসা তৈরির জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়।

৪.২ সেই স্থান থেকে নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা চিনে নেয়।

৪.৩ সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে দেখেছি।

৫. **উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো :** নির্মাণ, উপযোগী, ভর্তি, সন্ধান, ক্ষান্ত।

৬. **তুমি প্রতিদিন পিঁপড়ে, মৌমাছি, মাকড়সা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ তোমার চারপাশে দেখতে পাও। তাদের মধ্যে কোনো একটিকে পর্যবেক্ষণ করো, আর তার চেহারা, স্বভাব, বাসা বানানোর কৌশল ইত্যাদি খাতায় লেখো।**

কীট/পতঙ্গের নাম	
কোথায় দেখেছ	
চেহারা/গায়ের রং	
কীভাবে চলে	
কী খায়	
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	
বাসাটি দেখতে কেমন	
কীভাবে বানায়	

৭. **গঠনগতভাবে কোনটি কী ধরনের বাক্য লেখো :**

৭.১ ইতিমধ্যে মাটি শুকিয়ে বাসা শক্ত হয়ে গেছে।

৭.২ একবার হুল ফুটিয়ে নিরস্ত হয় না।

৭.৩ কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে পোকা ইচ্ছামতো ডিম পাড়বার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭.৪ ভিজা মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলি নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৮.১ কুমোরে-পোকার বাসাবাড়িটি দেখতে কেমন?

৮.২ কুমোরে-পোকা বাসা বানানোর প্রস্তুতি কীভাবে নেয়?

৮.৩ কুমোরে-পোকার বাসা বানানোর প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লেখো।

৮.৪ 'এইসব অসুবিধার জন্য অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে।'— কোন অসুবিধাগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

৮.৫ কুমোরে-পোকার শিকার ধরার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। শিকারকে সে কীভাবে সংগ্রহ করে?

৮.৬ 'বাসার আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না।'— কখন কুমোরে-পোকা তার বাসার আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না?

মিলিয়ে পড়ো

কীট-পতঙ্গের প্রতি মানুষের নানা কোমল অনুভূতির কথা তোমরা ইতিমধ্যে পড়েছ। এবার আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূরের সঙ্গে লেখিকার অন্তরঙ্গতার কথা পড়ে নাও।

আমার ময়ূর

প্রিয়ম্বদা দেবী

পাখি কে না ভালোবাসে, তাদের গান, তাদের চলাফেরা, সুন্দর ভঙ্গি কার না মন হরণ করে? বিশেষত তাদের যা আছে আমাদের তা নেই; তারা উড়তে পারে— পাখা মেলে দিয়ে আলো আর বাতাস সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কোথায় চলে যায়—আমরা ঘরে বসে বসে দেখি, আমাদের মন উড়ু উড়ু করে, তবু গাছের মতো এক জায়াগায় পোঁতা হয়ে আমরা আমাদের মনের ডালপালা নেড়েই মরি, চলতে পারিনে। তাই এই আকাশ বাতাসের সঙ্গী, বহু দেশদেশান্তরের সংবাদবহদের, আমাদের বড়ো রহস্যময় মনে হয়; তাদের সব খবর জানতে ইচ্ছে হয়।

খাঁচায় পুরে রাখলে তাদের উপর একটু অত্যাচার হয়, তাই আমি একবার একটি ময়ূর পুষেছিলাম। সেটি যখন প্রথমে এল তখন ছোট্ট কচি ময়ূরবাচ্ছা—ময়ূরছানা কী মুরগিছানা বোঝা কঠিন। কথায় বলে, ও যেন একটি ময়ূরছানা—তার মানে বাচ্ছা বয়সে কুশ্রী, ক্রমে সুন্দর হয়ে ওঠে। এরও তাই হলো—প্রথম যখন এল তখন না ছিল তার মাথার উপরে বঙ্কিম চূড়া, না ছিল তার চাঁদের টুকরো দিয়ে সাজানো, ছড়ানো বিচিত্র পুচ্ছ। গায়ের বর্ণ একেবারে মাটির মতো, শুকনো ঘাসের মতো।

ভালো করে খেতে পারত না, তাই তাকে হাতে করে খাইয়ে দিতে হতো। নিজের শক্তি নেই, তবু লোভটি পুরোপুরি ছিল—মুখে যতটা ধরে, খাবল দিয়ে তার চেয়ে বেশি মুখে পুরে, তারপর গিলবার সময়ই মুশকিল। তখন চোখ বুজে, ঘাড় বাঁকিয়ে, অনেক চেষ্টায় সেটি গলাধঃকরণ হতো, হওয়ামাত্র আর সে কষ্টের কথা মনে থাকত না, দ্বিতীয় গ্রাসটি নেওয়ার সময়ও ঠিক ওই ব্যাপার। তোমাদেরও বাপু কারও কারও ওই দোষ আছে — 'মুখে যতটা ধরে তার চেয়ে বেশি ভরে', বিষম খাবার জোগাড় করো; ওটা ভালো অভ্যাস নয়। দিব্যি পেট ভরে খেয়ে কিছুকালের জন্যে সে নড়াচড়া বন্ধ করে এক কোনায় পড়ে থাকত। চিংড়ি মাছ আর মোটা ভাত খেতেই সে বেশি ভালোবাসত, তার ফল, ধান চালের উপর তেমন আগ্রহ ছিল না।
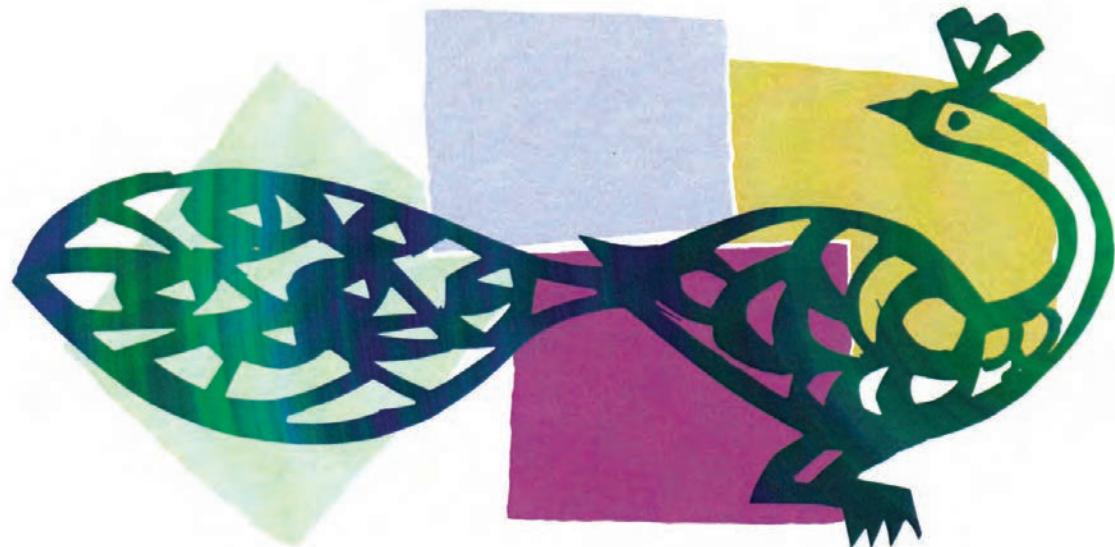
খাবার যত্নে সে শিগগিরই বেশ বেড়ে উঠল। তখন তার সর্বাঙ্গে রং-এর লীলা দেখা দিল — মাথার চূড়াটি বেড়ে উঠে সোনালি সবুজে ভরে উঠল, বাতাসে সেটি যখন কাঁপত তখন সুন্দর দেখাত। গায়ের মাটির বর্ণ সোনালি সবুজে নীলে মিশিয়ে যাকে ধূপছায়া আর ময়ূরকণ্ঠী রং বলে, তাই হলো — একটু নড়াচড়া করলে নীল বিজলি আলোকশিখার মতো একটি কিরণ তার গায়ের উপর ঢেউ খেলিয়ে যেত। পুচ্ছটি যেমন বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তেমনি তাতে নীলকান্ত মণির খণ্ড খণ্ড চাঁদ দেখা দিল।

তার চেহারা যেমন চোখ ভুলানো, ধরনধারণ, গতিভঙ্গি, তেমন মন ভুলানো হলো। ভারি দুষ্টু; অতিশয় মিষ্টি। আমি সকালে যখন ভাঁড়ার দিতে, তরকারি কুটতে যেতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। তার বরাদ্দ চাল ধান তার পছন্দ হতো না, আমার গোছানো জিনিস ঠুকরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিত — দাসীরা যদি তাড়া দিত, তবে উলটে তাদের তাড়া করত। আমি বকলে কিংবা মারবার ভান করলে, দাঁড়িয়ে চোখ মিট মিট করত; হয়তো বা আরও দুষ্টু হয়ে বেশি করে ছড়িয়ে দিয়ে, পাখা ছড়িয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াত—ভাবখানা যে, 'আমায় বুঝি মারবে? মারতে আর হয় না!' মারতে আর হতো নাই সত্যি, তার দুষ্টুমিষ্টি ভাব দেখে, তাকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে করত — আমি শুধু হাসতাম। আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে সে আদুরে ছেলের মতো আবদেরে হয়ে উঠেছিল — সমস্তক্ষণ পায়ে পায়ে ফিরত — কাজকর্মের সময় তার দিকে মন দিতে না পারলে কাপড় ধরে টানত। আমি যখন বসে বসে লিখতাম, আমার চৌকির হাতায় এসে বসত। তবু যদি তার দিকে না চেয়ে দেখতাম, তাহলে আমার হাতে ঠোকর দিত, এলোচুলের গুচ্ছ ধরে টানত— কাজেই অমনোযোগের ভান বেশিক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হতো।

যখন সে ছোটো ছিল তখন তাকে রাত্রিবাসের জন্য একটি বড়ো ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে ঘরের এক পাশে রাখা হতো, কিন্তু যত বড়ো হতে লাগল ততই এরকম আটক থাকতে আপত্তি দেখাতে আরম্ভ করল। তখন তাকে ছেড়ে রাখা হতো — সন্ধ্যার একটু আগেই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে, ছাদের পাশেই প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছে আশ্রয় নিত। সেখানেই রাত্রিযাপন করত। ভোর হলেই, তার সাড়া পাওয়া যেত, তখন আর সে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসত না — পাখা মেলে মহানন্দে উড়ে

নেমে আসত। প্রথমে খানিকটা বাগানময় ডানা মেলে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর প্রাতরাশ সমাধা করে, মাটির উপর বুক দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রোদ পোয়াতে খুব ভালোবাসত। দিনের মধ্যে খেলাধুলো লাফালাফি দুষ্টামির মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থাকত।

নিজে স্বাধীনভাবে চলে ফিরে বেড়াত, তাই খাঁচায় পোরা পাখি সে আদপেই দেখতে ভালোবাসত না। আমার একটি কেনারি, একজোড়া চিনে টিয়া আছে আর একটি ময়না ছিল। ময়নাটি বড়ো সুন্দর, পাহাড়ি ময়না, সচরাচর ময়নার চেয়ে অনেক বড়ো— গলার স্বর গম্ভীর, বেশ স্পষ্ট কথা কইত। আমি তাকে 'বন্দেমাতরম' বলতে শেখাচ্ছিলাম—দু-ছত্র শিখেছিল। এমন মন দিয়ে শুনত যে অল্প সময়ের মধ্যেই শিখতে পারত। এই পাখিটিকে বন্ধ থাকা দেখতে ময়ূরের মোটেই ভালো লাগত না, দু-তিনবার তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল; কৃতকার্য হয়নি। পাহারা বড়ো কড়া ছিল। একদিন দুপুরে সবাই শুয়েছে,

আমি আমার ঘরে বসে পড়ছি— বারান্দায় একটা খুব ঝটাপটির শব্দ শুনতে পেলাম— আমি মনে করলাম ময়ূরচন্দ্র নৃত্য করছেন, একবার ভাবলাম উঠে দেখি, কিন্তু হাতের বইয়ে মন একেবারে ডুবে ছিল, ওঠা সহজ হলো না। কিছুক্ষণ পরে দাসীরা খেয়ে এসে বলল, 'ওমা ময়না কোথায় গেল' — ময়ূর তার খাঁচা খুলে তাকে বিদায় করে দিয়েছে—আকাশের পাখি খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সেকি আর থাকে, কোথায় উধাও হয়ে গেল— আর ফিরে এল না।

যতদিন ময়ূর ছোটো ছিল, বাড়ির বাগানে বেড়িয়েই তার মন ভরত কিন্তু যত বড়ো হতে লাগল ততই চঞ্চলতা দেখা দিল— বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশীর ওখানে যেত, তারপর মালি গিয়ে তাকে খুঁজে খুঁজে বাড়ি আনত; অগত্যা দিন কতক পাখা বেঁধে রেখে দিতে হয়েছিল। বাড়িতেই থাকছে দেখে আবার খুলে দিলাম, একদিন ভোরে উঠে ময়ূরের আর দেখা নাই। আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—বেলা প্রায় ১টা —এমন সময় একজন ময়ূর কোলে করে এসে উপস্থিত হলো। হারাধন পেয়ে ভারি আনন্দ হয়েছিল।

চিঠি

জসীমউদ্দিন

চিঠি পেলুম লাল মোরগের ভোর-জাগানোর সুর-ভরা
পাখার গায়ে শিশু উষার রঙন হাসি রঙিন করা।
চিঠি পেলুম চখাচখির বালুচরের ঝিকিমিকি,
ঢেউ-এ ঢেউ-এ বর্ষা সেথা লিখে গেছে কত কী কী!
লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে,
জল-ধারার কল কল ভাসিয়ে আসর উজান সোঁতে।

চিঠি পেলুম কিচিরমিচির বাবুই পাখির বাসার থেকে,
ধানের পাতায় তালের পাতায় বুনট-করা নকশা এঁকে।
চিঠি পেলুম কোড়াকুড়ীর বর্ষাকালের ফসল-ক্ষেতে,
সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।
আকাশ জুড়ে মেঘের কাঁদন গুরু গুরু দেয়ার ডাকে,
উদাস বাতাস আছড়ে বলে কে যেন বা চাইছে কাকে।

ইহার সাথে পেলুম আজি খোকা ভাই-এর একটি চিঠি,
শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।
দূর আকাশের সুনীল পাতায় পাখিরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে
কত রকম ছড়ায় গড়ায়, মেঘের পাড়ায় পড়ায় কাকে।
সেই সে পড়া হরফ-করা খোকা ভাই-এর রঙিন হাতে
খুশির নূপুর ঝুমুর-ঝামুর বাজছে আমার নিরালাতে।

হাতে কলমে

জসীমউদ্দিন (১৯০৪ — ১৯৭৬) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরে গ্রাম-বাংলাকে কেন্দ্র করে কাব্যচর্চার ধারাটি তিনিই বজায় রেখেছিলেন। একান্ত সহজ সরল ভাষায় পল্লী প্রকৃতির অনাড়ম্বর রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাই বাংলা কাব্যজগতে 'পল্লী কবি' হিসেবে অভিহিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইগুলি হলো *রাখালী*, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, *বালুচর*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *মাটির কান্না* প্রভৃতি। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. প্রাপ্ত হন।

১.১ কবি জসীমউদ্দিনকে বাংলা কাব্য জগতে কোন অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ কবি কার কার থেকে চিঠি পেয়েছেন?

২.২ লাল মোরগের পাঠানো চিঠিটি কেমন?

২.৩ চখাচখি কেমন চিঠি পাঠিয়েছে?

২.৪ গাঙশালিক তার চিঠিতে কী বলেছে?

২.৫ বাবুই পাখির বাসার থেকে আসা চিঠিটি কেমন?

২.৬ কোড়াকুড়ীর পাঠানো চিঠিটির বর্ণনা দাও।

২.৭ কার চিঠি পাওয়ায় কবির মনে হয়েছে নিখিল বিশ্ব তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছে?

২.৮ এই কবিতায় কোন ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে?

২.৯ কবিতায় অন্য ঋতুর পটভূমি সত্ত্বেও খোকাভাই-এর চিঠির লেখনখানি 'শীতের ভোরের রোদের মতো' মিঠে মনে হওয়ার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২.১০ 'খুশির নূপুর ঝুমুর-ঝামুর বাজছে আমার নিরালাতে'— পঙ্‌ক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

শব্দার্থ : চখাচখি — স্ত্রী ও পুরুষ চক্রবাক একত্রে, হাঁস জাতীয় পরিযায়ী পাখিবিশেষ। গাঙ — নদী। সোঁতে — স্রোতে (এই কবিতায়)। কোড়াকুড়ী — স্ত্রী ও পুরুষ জলচর পাখি একত্রে। দেয়া — মেঘ। নিরালা — নির্জন। ঊষা — ভোর।

৩. কবিতা থেকে এমন তিনটি শব্দ খুঁজে বের করো যা কোনও ধ্বনির অনুকরণে তৈরি। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। **যেমন :** কল কল।

৪. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও:**

	>	রঙিন
গঙগা	>	
	>	সোঁতে
ক্রন্দন	>	

শব্দঝুড়ি
স্রোতে, রঙিগন,
কাঁদন, গাঙ

৫. **'ঢেউ-এ ঢেউ-এ'** এখানে 'ঢেউ-এ' শব্দটি পরপর দু'বার ব্যবহার হওয়ায় অর্থ দাঁড়িয়েছে, 'অজস্র ঢেউ-এ'। অর্থাৎ একই শব্দ পরপর দু'বার ব্যবহারে বহু বচনের ভাব তৈরি হয়েছে। এই কবিতাটি থেকে আরও তিনটি অংশ উদ্ধৃত করো যেখানে এমন ঘটেছে।

৬. **'গাঙের পাড়ের মোড়ল'**— শব্দবন্ধটিতে পরপর দু'বার '-এর' সম্বন্ধ বিভক্তিটি এসেছে। কবিতা থেকে এমন আরও শব্দবন্ধ খুঁজে বের করো যেখানে পরপর দু'বার 'র' বা 'এর' বিভক্তি প্রয়োগে সম্বন্ধ পদ তৈরি হয়েছে।

৭. **'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'— পদক্রম অনুসারে নীচের বাক্যগুলিকে আবার লেখো :**

৭.১ লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে।
৭.২ ইহার সাথে পেলুম আজি খোকা ভাই-এর একটি চিঠি।
৭.৩ সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।
৭.৪ উদাস বাতাস আছড়ে বলে কে যেন বা চাইছে কাকে।
৭.৫ শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।

৮. **নীচের বাক্যগুলিকে ভেঙে দুটি বাক্যে পরিণত করো :**

৮.১ চিঠি পেলুম লাল মোরগের ভোর-জাগানোর সুরভরা।
৮.২ সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।
৮.৩ শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।
৮.৪ আকাশ জুড়ে মেঘের কাঁদন গুরু গুরু দেয়ার ডাকে।
৮.৫ লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে।

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ কবি প্রকৃতির কোন-কোন প্রতিনিধির কাছ থেকে কেমন সমস্ত চিঠি পেয়েছিলেন, বিশদে লেখো।
৯.২ খোকা ভাই-এর চিঠিটির প্রসঙ্গে কবি যে সমস্ত উপমা ও তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদের ব্যবহারের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।
৯.৩ তোমার প্রিয় বন্ধুকে তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনাটি জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

মরশুমের দিনে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছোটো মফস্‌সল শহর। ডিপোয় বাস দাঁড়িয়ে। ধরাধরি করে ছাদে মাল তুলছে বাসের কনডাক্টর আর ক্লিনার। বাস যাবে দূরের শহরে কী গঞ্জে। সারা পথ সকলে যাবে না। গ্রামের যাত্রীরা নেমে নেমে যাবে মাঝরাস্তায়। কারও বা কোর্টে মামলা ছিল। কেউ বা এসেছিল সরকারি সেরেস্তায় হাকিমের কাছে দরবার করতে। কারও শক্ত রোগী আছে হাসপাতালে, দেখতে এসেছিল। কেউ এসেছিল দোকানের জন্য মাল তুলতে। ভিতরে নিজের নিজের জায়গায় হাতের জিনিস রেখে অনেকেই বাইরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই চায়ের দোকানে বেঞ্চির ওপর বসে ড্রাইভার চা খায়। সেদিকে নজর রেখে যাত্রীর দল কাছেপিঠে ঘুরঘুর করে। গরমের সময় গায়ে হাওয়া লাগায়, শীতের সময় রোদ পোহায়।

বাসে ভিড় দেখতে হয় মাঠে ফসল উঠলে। মেয়ে দেখতে, পুজো দিতে লোকে এখানে সেখানে যায়। জিনিস কিনতে, সিনেমা দেখতে, মামলার তদবির-তদারক করতে শহরে যায়। উকিল-মোক্তার, বামুন-পুরুত, দরজি-দোকানি দুটো পয়সার মুখ দেখে। গ্রামের সঙ্গে শহরের যে এখনও নাড়ির টান, এই সময়টা তা বিলক্ষণ বোঝা যায়।

ধন বলতে ধান। কথাটা আজও সত্যি। ধানের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি। মাটি দেয় ফসল, আকাশ জল। ফসল আর জলবৃষ্টির কামনা করেই লোকের সারা বছর কাটে।

দেশি মতে আগে বছর শুরু হতো জলবৃষ্টি আর ফসলের সময় থেকে। মাসের নাম আর ঋতুর নামের মধ্যে আজও তার স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

আগে বছর আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণে। হায়ন মানে বছর। অগ্রহায়ণ মানে বছরের গোড়া। হায়ন কথাটার আর এক মানে ফসল।

বছরকে আমরা বলি 'বর্ষ'। জলবৃষ্টির সময় এককালে বছর শুরু হতো বলে মরশুমের নাম হয়েছিল 'বর্ষ'। এদেশের যত পালা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, সব কিছুরই মূলে রয়েছে চাষবাস।

শহর ছাড়ালেই দু-পাশে দেখা যাবে মাথার ওপর দরাজ আকাশ। বাস-রাস্তার দু-ধারে বটপাকুড় শাল সেগুনের গাছ। তার ডালে দৃষ্টি মাঝে মাঝে আটকে যাবে। কালো কুচকুচে বাঁধানো রাস্তা। মাঝে মাঝে বাঁক নিয়ে সোজা সামনে চলে গেছে।

গরমকালে চারদিকে হাওয়া যখন আগুনের মতো তেতে থাকে, তখন এই রাস্তার ওপরই এক ভারি মজার দৃশ্য দেখা যায়। যেতে যেতে মনে হয়, দূরে যেন জল চিকচিক করছে। আর সেই জলে উলটো হয়ে পড়েছে দু-পাশের গাছের ছায়া। কাছে যাও। কোথায় জল, কোথায় ছায়া! ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো।

বাস রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে লোকালয়। বড়ো গ্রাম হলে ইটের দালান দেখা যাবে। নইলে মাটির বাড়ি। খড় কিংবা টিনের চাল। লোকালয় পার হলেই আবার আদিগন্ত মাঠ। একেক ঋতুতে তার একেক চেহারা।

শরতে দেখবে যতদূর দৃষ্টি যায় নীলরঙের আকাশটাকে কেউ যেন ঝকঝকে তকতকে করে মেজে রেখেছে। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। রোদ যেন কাঁচা সোনার মতো। নীচে কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না। সামনে পিছনে একটানা সবুজ ধান। সমুদ্রের মতো তার পার দেখা যায় না। তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলে যায় হাওয়ায়। দূরে দূরে জেগে থাকে একটা দুটো তালখেজুর কিংবা শিশুপলাশ।

ধানকাটার পর একেবারে আলাদা দৃশ্য। যতদূর দৃষ্টি যায় রুক্ষ মাটি। শুকনো কঙ্কালসার চেহারা। আলগুলো জেগে থাকে বুকের হাড়পাঁজরের মতো। মাঠের ভিতর দিয়ে পায়ে পায়ে রাস্তা ফুটে ওঠে গ্রামে যাওয়ার। আকাশের রং তখন তামার হাঁড়ির মতো। রোদের দিকে তাকানো যায় না। গোরুর গাড়ির চাকায়, মানুষের পায়ে মাটির ডেলাগুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়। সেই ধুলো কখনও ঘূর্ণি হাওয়ায় কখনও দমকা হাওয়ায় উড়ে উড়ে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়ায়। একটু বেলা হলেই মাটি তেতে

আগুন হয়ে ওঠে। যারা হালবলদ নিয়ে ভোরে মাঠে গিয়েছিল, বেলা বাড়লেই তারা যত তাড়াতাড়ি পারে ঘরে ফিরবে। নদী পুকুর খাল-বিল শুকিয়ে যায়। গাছে পাতা থাকে না। খাল-বিল নদী-নালার ধারে ধারে ছাড়া কোথাও ঘাসের ডগা দেখা যায় না। রাখালের দল ছড়ি-পাঁচন হাতে বটঅশথের ছায়ায় বসে থাকে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় আগুনের হলকা দেয়। জলের জন্য চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। লোকে সেইসময় ছায়া খুঁজে খুঁজে যাবে। পায়ে চলা রাস্তা যাবে বটঅশথের তলা দিয়ে, আমকাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়। বাঁধানো ইঁদারা, নদীনালা, তালপুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে। যেখানে হাতের কাছে পিপাসার জল পাওয়া যাবে।

আকাশের জল চেয়ে বসুধারা ব্রত করবার এই হলো সময়। কেন-না এখন :

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!

কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!

নদী শুকু শুকু, আকাশের ছাই!

কোথাও বা চাষির ঘরের বউরা করে ক্ষেত্রব্রত। তারা যায় বাড়ির কাছের খোলা জমিতে। নিজেরা ঘট প্রতিষ্ঠা করে তার গায়ে সিঁদুর-পুত্তলি এঁকে ঘটের জলে আমের পল্লব ডুবিয়ে দেয়। বুড়িদেরই

কেউ হয় মূলব্রতী। হাতে ফুল আর দূর্বা নিয়ে ব্রতীর দল তার মুখ থেকে শোনে ব্রতের কথা। সন্ধে নাগাদ উলু দিয়ে ব্রত শেষ হয়। তারপর মাঠে বসেই চিঁড়ে-গুড়-মুড়ি-খই আর দই দিয়ে ফলার খায়। ছেলেরাও ওইদিন ভোরে একজন কারো মাঠে গিয়ে জমিতে লাঙল দিয়ে বীজধান পুঁতে জমিতে জল ছড়িয়ে আসে।

কোথাও আছে বৃষ্টির অভাবে 'মেঘারানির কুলো' নামাবার প্রথা। কুলো, জল ঘট নিয়ে চাষিঘরের অল্পবয়সি মেয়েরা দলে দলে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে তারা পায় চাল-তেল-সিঁদুর, কখনও দু-চারটে পয়সা আর পান-সুপারি। দল বেঁধে তারা গায় :

হ্যাদে লো বুন মেঘারানি
হাত পাও ধুইয়া ফেলাও পানি।
ছোটো ভুঁইতে চিনচিনানি
বড়ো ভুঁইতে হাঁটুপানি।
মেঘারানির ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি নামে লো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালা মেঘা ধলা মেঘা বাড়ি আছনি?
গোলায় আছে বীজধান, বুনাইতে পারোনি?

মেঘকে নামাবার জন্য তারা নানা লোভ দেখায় :

কালো মেঘা নামো, ফুলতোলা মেঘা নামো
ধুলোট মেঘা, তুলোট মেঘা, তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা টলমল, বার মেঘার ভাই
আরও ফুটিক জল দিলে ফুটিক চিনার খাই।
কালো মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব সিঁদুর মেঘার গায়
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।

কখনো-কখনো হঠাৎ বিকালের দিকে আকাশ কালো হয়ে আসে। ঝিম-ধরা আকাশে দেখা দেয় বেগবান মেঘ। মেঘের কোলে চমকাতে থাকে বিদ্যুৎ। তারপর নারকেল-তাল-খেজুর গাছের মাথাগুলোকে

হেলিয়ে দিয়ে নেমে আসে আচমকা ঝড়। জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা তপ্ত মাটিতে পড়তে না পড়তে মিলিয়ে যায়। মেঘ যতই ডাকুক, যত গর্জায় তত বর্ষায় না। কখনো-কখনো শিলাবৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে জুড়িয়ে যায় গ্রীষ্মের তাপ। ছেলেরা হই হই করে ছোটে আমবাগানে। অন্ধকার হলে সঙ্গে হারিকেন নেয়। সুর করে করে বলে :

ঝড় ঝড় ঝড়
একটি আম পড়।
একটি আম পড়িসনে কো
তলা বিছিয়ে পড়।
খুকু খাবে পেট ভরে
নিয়ে যাবে ঘর।।

হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘ। বৃষ্টি আসি আসি করেও আসে না। আকাশ আগের অবস্থায় আবার ফিরে যায়। তবু বর্ষায় মরশুমের জন্য এখনই তৈরি হতে হয়। সারা গ্রামে চলে বর্ষার প্রস্তুতি।

হঠাৎ একদিন ঝমঝম করে পড়ে বৃষ্টি। গরম মাটিতে জল পড়ে ভাপ ওঠে। চাষিদের মুখে হাসি ফোটে। ছোটো ছোটো ছেলেরা আনন্দে দুলে দুলে ছড়া বলে : 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।' ছোকরার দল দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে প্রথম বৃষ্টিতে হই হই করে ভেজে। মাটির সোঁদা গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ডুবে যায়। বৃষ্টির ছন্দে ছেলেরা ছড়ার ঝুলি উপুড় করে দেয়। সুর করে করে বলে :

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে—
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।

তারপর ক-দিন সমানে বৃষ্টি। হোগলার তৈরি মাথালে মাথা পিঠ ঢেকে দুরন্ত জলের মধ্যেই গামছা পরে চাষিরা বেরিয়ে পড়ে মাঠের কাজে। ধান রোয়া, আল বাঁধার কাজ এখনই সেরে ফেলতে হবে। ধান ছাড়াও কারো আছে পাটের জমি। তারও বিস্তর কাজ।

গ্রামদেশে বনে বনে ফুল ফুটিয়ে বসন্ত কবে আসে কবে যায় ভালো করে ঠাহরই পাওয়া যায় না দক্ষিণের হাওয়াই শুধু বসন্তকে মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু বর্ষা নামলে একবার শুধু বাইরে এসে দাঁড়াও যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে। জমিতে ধান ডিগডিগ করে বেড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে নিড়িয়ে দিতে হয় মাঠ। কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় মাঠের কাজ। তখন শুধু ফসলের অপেক্ষায় বসে থাকা।

বর্ষার শেষাশেষি মেয়েরা করে ভাদুলি ব্রত। মাটিতে আঁকে আলপনা : সাত সমুদ্র। তেরো নদী। নদীর চড়া। কাঁটার পর্বত। বন। ভেলা। বাঘ। মোষ। কাক। বক। তালগাছে বাবুইয়ের বাসা।— এ ব্রত সেইদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সাতডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্যে যেত। ব্রতের ছড়ায় আজও সে ছবি ধরা আছে। ‘বাপ গেছেন বাণিজ্যে, ভাই গেছেন বাণিজ্যে, সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে’ — তারা যেন নিরাপদে ফিরে আসে। ভাদ্রের ভরা নদীকে ডেকে দুরুদুরু বক্ষে তারা ব্যগ্রতা জানায় :

নদী! নদী! কোথায় যাও
বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।
নদী! নদী! কোথায় যাও
স্বামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।

আজ সেই সওদাগরও নেই, সেই বাণিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভিতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে,* প্রভৃতি। তিনি *হাফিজ, নাজিম হিকমত* ও *পাবলো নেরুদার* কবিতা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি *জ্ঞানপীঠ* পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত *কাঁচা-পাকা, ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন* প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠ্য রচনাংশটি তাঁর *নারদের ডায়েরি* নামক বইয়ের *মরশুমের দিনে* রচনার অংশবিশেষ।

১.১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা একটি গদ্যের বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ধান শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

২.২ ‘অগ্রহায়ণ’ বলতে কী বোঝায়?

২.৩ এদেশের সমস্ত পালা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসব — এসবের মূলে কী রয়েছে?

২.৪ বসুধারা ব্রত কোন ঋতুতে হয়?

২.৫ মেঘকে নামাবার জন্য মেয়েরা দল বেঁধে ছড়া করে তাকে কী কী নামে ডাকে?

৩. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

মফস্বল, বৎসর, খর, ব্রত, বিস্তর, পর্বত, ঝড়।

৪. **নীচের বাক্যগুলি গঠনগতভাবে কোনটি কী ধরনের লেখো (সরল/ যৌগিক/জটিল) :**

৪.১ গ্রামের যাত্রীরা নেমে নেমে যাবে মাঝরাস্তায়।

৪.২ যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে।

৪.৩ আয়বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।

৪.৪ খড় কিংবা টিনের চাল।

৫. **নীচের বাক্যগুলি থেকে শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

৫.১ কেউ এসেছিল দোকানের জন্য মাল তুলতে।

৫.২ বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ডুবে যায়।

৫.৩ সন্ধে নাগাদ উলু দিয়ে ব্রত শেষ হয়।

৫.৪ ছেলেরা হই হই করে ছোটে আমবাগানে।

৬. **পাঠ থেকে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ খুঁজে লেখো :**

অম্বর, ধরা, মৃত্তিকা, প্রান্তর, তটিনী।

৭. **নীচের সমোচ্চারিত/প্রায়- সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লেখো :**

ধোয়া—	জলে—	বাধা —	গায়ে —	ঝরে —
ধোঁয়া—	জ্বলে—	বাঁধা —	গাঁয়ে —	ঝড়ে —

শব্দার্থ : মফস্সল — শহর বা নগরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো, সমৃদ্ধ জনপদ। ডিপো — আড়ত। সেরেস্তা — কার্যালয়, দফতর। তদবির-তদারক — দেখাশুনা, পরিচালনা করা। বিলক্ষণ — নিশ্চিত। পালাপার্বণ — বিভিন্ন উৎসব। দরাজ — মুক্ত, খোলা। লোকালয় — জনপদ। আদিগন্ত — আকাশের সীমান্তরেখা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। আল — ক্ষেতের সীমারেখা নির্দিষ্ট করার জন্য বাঁধ। মাথাল — টোকা, ঘাসপাতা দিয়ে তৈরি ছাতাবিশেষ। ভাদুলি ব্রত — বাংলার লৌকিক দেবী ভাদুর নামে ভাদ্র মাসে যে ব্রত হয়। ব্যগ্রতা — ব্যাকুলতা।

৮. **শুদ্ধ বানানটিতে '✓' চিহ্ন দাও**

৮.১ মুহুর্ত/মূহুর্ত/মুহূর্ত

৮.২ অঘ্রহায়ন/অগ্রহায়ন/অগ্রহায়ণ

৮.৩ বিলক্ষণ/বিলক্ষন/বিলখ্যন

৮.৪ মরিচিকা/মরীচিকা/মরীচীকা

৯. **বেলা, ডাল, সারা, চাল— এই শব্দগুলিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য লেখো।**

১০. **টীকা লেখো :** মরীচিকা, বসুধারা, ব্রত, মেঘরানীর কুলো, ভাদুলি।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ বাস-ডিপোয় অপেক্ষমান যাত্রীদের ছবি কীভাবে পাঠ্যাংশে ধরা পড়েছে।

১১.২ 'গ্রামের সঙ্গে শহরের যে এখনও নাড়ির টান' — এই নাড়ির টানের প্রসঙ্গ রচনাংশে কীভাবে এসেছে?

১১.৩ 'ধানের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি' — বৃষ্টির সময়ে ধানক্ষেতের ছবিটি কেমন? অন্য যে যে সময়ে ধান চাষ হয়ে থাকে, তা লেখো।

১১.৪ 'আগে বছর আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণে' — এর সম্ভাব্য কারণ কী?

১১.৫ 'এদেশের যত পালা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, সব কিছুরই মূলে রয়েছে চাষবাস।' — বাংলার উৎসব—খাদ্য—সংস্কৃতির সঙ্গে চাষবাস কতটা জড়িত বলে তুমি মনে করো?

১১.৬ 'শহর ছাড়ালেই দু-পাশে দেখা যাবে' — শহরের চিত্রটি কেমন? তা ছাড়িয়ে গেলে কোন দৃশ্য দেখা যাবে?

১১.৭ 'এই রাস্তার ওপরই এক ভারি মজার দৃশ্য দেখা যায়' — মজার দৃশ্যটি কেমন তা নিজের ভাষায় লেখো।

১১.৮ 'ব্রতের ভিতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে' — শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে এমনই কিছু 'ব্রত'র ছড়া খাতায় সংগ্রহ করো।

১১.৯ বিভিন্ন ঋতুবিষয়ক প্রচলিত ছড়া আর ছবি সাজিয়ে নিজেরা লিখে বিদ্যালয়ে একটি দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো।

১১.১০ 'ধান কাটার পর একেবারে আলাদা দৃশ্য' — এই দৃশ্যে কোন ঋতুর ছবি ফুটে উঠেছে? সেই ঋতু সম্পর্কে কয়েকটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

মিলিয়ে পড়ো

'মরশুমের দিনগুলি' পড়ে তোমরা গ্রামবাংলার মাঠঘাট, ব্রতকথা সম্পর্কে জেনেছ। এরই সঙ্গে জেনে নাও নবাবি আমলের মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় আরও একটি উৎসবের কথা।

খোজা খিজির উৎসব

বিনয় ঘোষ

ভোরবেলা এবং মধ্যরাতে নবাবপ্রাসাদের থেকে বাদ্যসংগীতের সুর ভেসে আসে কানে। অতীতের নবাবি আভিজাত্যের রেশ এই সুরের মধ্যে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

নাগরা, ঢোল কাড়ানাকাড়া সহযোগে শিঙা সানাই ইত্যাদি সুরের মিশ্রণ একটা করুণ বিষণ্ণ রাগিণীতে ধ্বনিত হয়ে বাতাসে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সেই সুরতরঙ্গে অতীতের নবাবি আমলের স্মৃতি ভাগীরথীর বুকে জেগে উঠে আবার ভাগীরথীর বুকেই বিলীন হয়ে যায়।

নবাবপ্রাসাদের এই সুরের মতো মুর্শিদাবাদের দু-একটি উৎসব আছে যা আজও নবাবি আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরকম একটি উৎসব হলো 'খোজা খিজির' বা বেরা উৎসব। বেরা উৎসব ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রে ভরা নদী ভাগীরথী উৎসবের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই জলময় প্রাঙ্গণ আলোর ভেলায় ও ছোটোবড়ো জলযানে আলোকময় হয়ে ওঠে। ভেলা ও জলযান নির্মাণ এবং তাদের রূপসজ্জার

কাজ উৎসবের অনেক আগে থেকেই কারুশিল্পীরা করতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ নগরের কাছে জাফরগঞ্জ একটি বড় নির্মাণকেন্দ্র। বাঁশ ও কলাগাছ নির্মাণের প্রধান উপাদান। গ্রামাঞ্চল থেকে এই সব উপাদান সংগ্রহ করা হয়। বাঁশ থেকে জাফরি, ছেঁচা, চালি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

নবাবি আমল থেকে একশ্রেণির দক্ষ কারিগর এই ভেলা ও জলযান নির্মাণের কাজ বংশানুক্রমে করে আসছেন। সেকালের মহরম ও খোজা খিজির উৎসব উপলক্ষে কুশলী শিল্পীদের নিয়োগ করা হতো, অভ্রের পাত দিয়ে তৈরি আলো চিত্রিত করার জন্য। এই সমস্ত অভ্রের তৈরি আলোকে কোরানের বাণী, মসজিদ, গাছপালা ও নানারকমের মূর্তি চিত্রিত করার প্রথা ছিল। চিত্রণের কাজে শত-শত শিল্পী নিযুক্ত হতেন। ভেলা ও জলযানগুলিকে বহুবর্ণের দীপালোকে সাজানো বেশ উচ্চাঙ্গ শিল্পীদের কাজ ছিল। কলাগাছ জলে ভাসিয়ে তার উপর বাঁশ-বাঁখারি-ছেঁচা-চাটাই দিয়ে মিনার তোরণ গম্বুজ নিশান দুর্গ ইত্যাদির কাঠামো তৈরি করে সাজানো হয়। কতকগুলি জলযান দ্বিতল-ত্রিতল রণতরীর মতো করা হতো। নানারকম রঙিন কাগজ অভ্র রাংতা ইত্যাদি দিয়ে জলযানগুলিকে মুড়ে দেওয়া হতো। রুপালি আচ্ছাদনে আবৃত কৃত্রিম ঝাড়লণ্ঠন জলযানে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ধীরে-ধীরে উৎসবের বিশেষ দিনটি যত এগিয়ে আসত তত লোকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকত, কবে ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার আসবে এবং ভাগীরথীর ভরাবুক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

হাজারদুয়ারি প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাটে নবাববাড়ির উত্তরে প্রায় মাইল দুই দূরে মহীনগরের নীচে ভাগীরথীর জলে ভেলা সাজিয়ে রাখা হতো। তোপখানা থেকে কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে বেরার ভেলা ভাসানোর সময় ঘোষিত হতো। লালবাগ থেকে মহীনগর পর্যন্ত গঙ্গার তীর আলোয় আলোকময় হয়ে কি অপূর্ব দৃশ্য রচনা করত নবাবি আমলে, তা আজকের উৎসবের দৃশ্য দেখেও কল্পনা করা যায়।

তোপখানা থেকে কামানদাগা হলে ভেলার দড়ির বাঁধন কেটে দেওয়া হয়। নৌবহরের মতো ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে ভেসে যেতে থাকে। এইসময় মতিমহল থেকে বেশ বড় একটি জৌলুসের অনুগামী হয় সুসজ্জিত হাতি ঘোড়া উট অশ্বারোহী ও পদাতিক। জলযানগুলিও মন্থর গতিতে চলতে থাকে এবং তার তালে তালে বাজনা বাজতে থাকে। সেকালের সদাগরি ডিঙ্গার মতো কয়েকটি মকরমুখো নৌকাও দেখা যায়, তার উপরে চারচালা বাংলো।

জলদেবতা খাজা খিজিরের স্মরণোৎসব এই বেরা উৎসব বা ভেলা-ভাসান পরব। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের উৎপত্তি হয়নি, মোগল আমলেই হয়েছে, কারণ রাজধানী ঢাকাতেও এই উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতো। বাঙালি হিন্দু সদাগরদের বাণিজ্যযাত্রার নানান রকমের উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণ মধ্যযুগের সাহিত্যে আছে। বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্যেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হিন্দু উৎসবের সঙ্গে বেরা উৎসব মিলিত হয়ে, নবাবদের পোষকতায়, এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে, বিশেষ করে বাদ্য চিত্র ও আতসবাজির সংমিশ্রণে । বাংলার কুশলী মুসলমান লোকশিল্পীদের দান এই উৎসবে স্মরণীয়, এবং তাঁদের অভাব ছিল না মুর্শিদাবাদে।

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পুবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণিহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস,
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রুপ-বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি;
হানাহানি করে কেউ নিল ভ'রে,
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি পরখের ছল —
বিকালবেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে — এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরোনো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।।

হাতে কলমে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) : জন্মস্থান শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম। পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। রবীন্দ্র সমসময়ে যে সমস্ত কবি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *কল্লোল* গোষ্ঠীর জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, ত্রিযামা, সায়ম্, নিশান্তিকা* প্রভৃতি। বাংলা কাব্যজগতে তিনি *দুঃখবাদী* কবি অভিধা পেয়েছিলেন।

১.১ কোন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের বাক্যগুলি থেকে এমন শব্দ খুঁজে বের করো যার প্রতিশব্দ কবিতার মধ্যে আছে। কবিতার সেই শব্দটি পাশে লেখো :**

২.১ ‘আঁধার-সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছে।’

২.২ ‘আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবন-ভরা।’

২.৩ ‘তুমি আমার সকালবেলার সুর।’

২.৪ ‘আমার রাত পোহাল শারদ-প্রাতে।’

২.৫ ‘দিনেরবেলা বাঁশী তোমার বাজিয়েছিলে।’

৩. **সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :**

দীপ—	দর—	শাখ—	বাধা—	নিত্য—
দ্বীপ—	দড়—	শাঁখ—	বাঁধা—	নৃত্য—

শব্দার্থ : প্রভাত — সকাল। নিশা — রাত্রি। শ্রেণিহারা — দল থেকে বিচ্ছিন্ন। পাখে — ডানায়। পাকুড় — বট জাতীয় গাছ বিশেষ। শাখে — শাখায়, গাছের ডালে। দোচালা — দুটি ছাদ বা চাল যুক্ত বাড়ি। মুদিল --- নিমীলিত করল, বুজল। তরে --- জন্যে। আহ্বান --- আমন্ত্রণ, ডাক। বিদ্রূপ — ব্যঙ্গ, ঠাট্টা। জীর্ণ — বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত। কোলাহল — গোলমাল, চিৎকার। ছিন্ন — ছেঁড়া। চরণচিহ্ন — পায়ের চিহ্ন। পসরা — পণ্যদ্রব্য। ক্রেতা — খরিদ্দার। বিমল — নির্মল। সহি --- সহ্য করি। পরখ --- যাচাই করা। বিকায় --- বিক্রি হয়। হেলায় --- অবহেলায়। নিত্য — রোজ। গাঁট — ট্যাঁক, সঞ্চয়স্থান।

৪. **নীচের শব্দগুলি গদ্যে ব্যবহার করলে কেমন হবে লেখো :** সহিয়া, সেথা, সহি, সবে, তবে, মুদিল।

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৫.১ কতগুলি গ্রামের পরে সাধারণত একটি হাট চোখে পড়ে?

৫.২ হাটে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না কেন?

৫.৩ কার ডাকে রাত্রি নেমে আসে?

৫.৪ ও পারের লোক কেন এ পারেতে আসে?

৫.৫ 'হিসাব নাহিরে — এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।' — কোনো হিসাব নেই কেন?

৬. **কবিতায় বর্ণিত হাটের চেহারাটি কেমন লেখো :**

হাট বসার আগে	হাট চলাকালীন	হাট ভাঙার পর

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৭.১ হাটের স্থান ছাড়িয়ে দূরের গ্রামের ছবি কীভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে?

৭.২ প্রকৃতির ছবি কীরূপ অসীম মমতায় কবিতায় আঁকা হয়েছে—তা আলোচনা করো।

৭.৩ 'বাজে বায়ু আসি বিদ্রুপ-বাঁশি'—কবির এমন মনে হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৭.৪ 'উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।' — কোন প্রসঙ্গে কবি আলোচ্য পঙক্তিটি লিখেছেন? তিনি এখানে কোন 'খেলা'-র কথা বলেছেন? 'চিরকাল' চলে বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৭.৫ তোমার দেখা কোনো হাটের/বাজারের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দূরে থাকে এমন কোনো বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো?

৭.৬ তোমার দেখা একটি হাট বা বাজারের ছবি তুমি এঁকে দেখাও।

৭.৭ এখন 'হাট' ও 'বাজার'-এর মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পাও? এ বিষয়ে তোমার মতামত জানিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র

তপন কর

দেয়ালচিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত গ্রামের মেয়েরাই। সেই চিত্রণের বিষয়বস্তু যেমন নিজেরা নির্বাচন করেন, তেমনি তার উপাদানও নিজেরাই সংগ্রহ করেন। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তারা বের করে নেন সংসারের নিজস্ব নিয়মিত কাজগুলির মধ্যেই।

লোকে যাকে চলতি ভাষায় পুরুল্যা বলেন, সাধুভাষায় বলেন পুরুলিয়া, সেই জেলাকে কেন্দ্র করে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে লোকসমাজে দেয়ালে ছবি আঁকার চল আছে। পূর্বতন মানভূম জেলার ভৌগোলিক সীমানাটিকে বাংলার দেয়ালচিত্র চর্চার পীঠস্থান বলা যায়। এর সঙ্গে সংলগ্ন জেলা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ, বীরভূম জেলাতে প্রচুর দেয়ালচিত্রণ হয়ে থাকে।

মানভূমে সাঁওতাল, হো, অসুর, ভূমিজ, মুন্ডা, ওঁরাও, খেড়িয়া, শবর, কোল, বীরহড় প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকলেও এদের মধ্যে মাটির ঘর তৈরি তথা দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে সাঁওতালরাই অগ্রসর। পাশাপাশি ভূমিজ ও খেড়িয়াদের চিত্রণও যথেষ্ট উন্নত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মাটি সুলভ হওয়ায় মানুষ গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ হিসাবে মাটিকেই বেছে নিয়েছে। মাটির ঘরের দেয়ালের এই চিত্রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি অস্থায়ী। সাধারণত আশ্বিনের দুর্গাপূজা ও কার্তিকের অমাবস্যা বা দীপাবলি, এই দুই উৎসবকালকে উপলক্ষ করে দেয়ালচিত্রগুলি রচিত হয়। চিত্রণগুলি গৃহের সৌন্দর্যের জন্য অলংকার হিসেবে করা হয়। সাধারণভাবে লালচে 'গিরিমাটি' বা গৈরিক বর্ণের মৃত্তিকায় 'গিরিফল' চুবিয়ে গৃহদ্বারের শীর্ষে ও দুইপাশে ছাপ দেওয়ার প্রথা বাংলার কৃষিজীবী সমাজে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

সাঁওতাল ভূমিজ, মাহাত বা কুর্মি, বাউরি, শবর ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি কালীপূজা অর্থাৎ কার্তিকের অমাবস্যাকেই গৃহ-মার্জনা ও অলংকরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এই তিথিতেই রাঢ়বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজের প্রাচীন উৎসব গো-বন্দনা, অলক্ষ্মী বিদায়, কাঁড়াখুটাঁ, গোরুখুঁটা প্রভৃতি পালিত হয়। সমগ্র ঘর-বাড়ি মেরামতি, লেপা-মোছা করার পর গৃহাঙ্গনের প্রবেশদ্বার থেকে উঠান, গোহাল, ধানের গোলা বা মরাই এবং মূল বাসগৃহ, সর্বত্র আলপনা দিয়ে সাজানো হয়।

মূলত জ্যামিতিক আকার-আশ্রিত বর্ণ সমাবেশেই রচিত হয় সাঁওতালি দেয়ালচিত্র। এতে যেমন দেখা যায় চওড়া রঙিন ফিতের মতো সমান্তরাল রেখা তেমনি থাকে চতুষ্কোণ ও ত্রিভুজের ছড়াছড়ি। চতুষ্কোণের ভিতর চতুষ্কোণ বসিয়ে করা হয় নকশা কিংবা ত্রিভুজের ভিতর বসানো হয় আরও ত্রিভুজ। সাধারণত ঘরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে থাকা মূল বেদিটিকে করা হয় কালো। তার সমান্তরালে টানা হয় বিঘতখানেক চওড়া গেরুয়া রঙের একটি রেখা, আবার তার উপর সমান ছাড় দিয়ে আর একটি সমান্তরাল কালো রেখা। এর উপরে সাদা, আকাশি, গেরুয়া বা হলদে রঙের রেখা দিয়ে চতুষ্কোণ বা ত্রিভুজগুলি হতে পারে। সেগুলি পাশাপাশি বসে দেয়ালটিকে ভরিয়ে তোলে। সাধারণত এভাবে মাটি থেকে ছ-ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি বিস্তৃত হয়।

সাঁওতাল ব্যতীত অন্যদের মধ্যে ভূমিজ, কুর্মি বা অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষেরা যে চিত্রণ করে থাকেন তার সাধারণ লক্ষণ হল পদ্ম। একটা বৃত্তের পরিধিতে যেকোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে আরেকটি বৃত্ত টানলে পরিধির উপর যে ছেদবিন্দুদ্বয় পাওয়া যায় তার উপর পুনরায় কেন্দ্র করে ক্রমাগত বৃত্ত টানতে থাকলে ক্রমে একটি পদ্মের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। এই পদ্মের পাপড়িগুলি বিচিত্র বর্ণে ভরে দেওয়া হয়। কখনো

কখনো দেখা যায় একটা টব বা কলস থেকে ফুলের গাছটি উঠে আসছে এবং দু-পাশে শাখা ছড়িয়ে শাখার আগায় ফুল ফোটাচ্ছে। সেখানেও বিকশিত পুষ্পটি শতদল বলেই বোঝা যায়। এই পদ্মটিকে মানভূমী দেয়ালচিত্রের প্রতীক বলা হয়।

এর পাশাপাশি অপর যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলো 'মোরগঝুঁটি'। এটি খুবই জনপ্রিয় এবং বিশেষত্বপূর্ণ। যখন মোরগঝুঁটিকে চালচিত্রের মধ্যে স্থাপন করে অন্যান্য মোটিফ সংযুক্ত করে জড়োয়া সাজ করা হয় তখন বলা হয় মোরগঝুঁটির ঝাড় বা মুরগা ঝাড়। চালচিত্রটির ধারে ধারে সারিবন্ধ থাকে উদীয়মান সূর্যের নকশা। সূর্যগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে একটি করে আধফোটা পদ্ম। এর বাইরে যে শূন্যস্থান পড়ে থাকে সেখানে বসানো হয় নানারকমের ছোটো ছোটো মোটিফ। সেগুলির মধ্যে পদ্ম তো থাকেই, তার সঙ্গে ইস্কাবন, হরতনের চিহ্ন ও সাধারণ লতাপাতা, পাখি, ময়ূর ইত্যাদিও থাকে। উল্লেখ্য, এই ধরনের বিস্তৃত আকারের ছবি যেমন লাল, নীল, সাদা, গেরুয়া ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ আঁকা হয়, তেমনি বর্ণ ছাড়াও আঁকা হয়।

অত্যন্ত মসৃণভাবে নিকানো দেয়ালে অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের বেলেমাটির গোলা দিয়ে নাতা দেওয়া হয়। এই মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ ও সাদাটে। সাদাটে বলেই এ মাটির স্থানীয় নাম 'দুধেমাটি'। এই মাটির প্রলেপটি ভিজে থাকতে থাকতেই এর উপর হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ টেনে এঁকে দেয় ছবি।

বিষয় হিসেবে পূর্বে বর্ণিত মোরগঝুঁটির ঝাড় তো থাকেই, তার সঙ্গে 'কদমঝাড়', 'শালুকলতা'-ও প্রায়শ চোখে পড়ে।

এই চিত্রকলা কোনো গোপন স্থান বা আড়ালে করার রীতি নেই, বরং দূর থেকে দৃশ্য হিসেবে মানানসই হবে এমনভাবেই দেয়াল নির্বাচন করা হয়। সেজন্য শুধু বাসগৃহের দেয়াল নয়, প্রাচীরগাত্র কিংবা অন্য যেকোনো রকম ঘরের দেয়ালও নির্বাচিত হয়।

তপন কর (জন্ম ১৯৫৪) : হাওড়ায় বসবাস করেন। সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে স্নাতক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বই– *অসামান্য মানভূম, ছবি আঁকতে শেখা* প্রভৃতি। *মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র* রচনাংশটি লেখকের *মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র* প্রবন্ধের একটি সংকলিত ও সংক্ষেপিত অংশ।

১.১ লেখক তপন করের লেখা একটি বই-এর নাম লেখো।

১.২ পাঠ্য রচনাংশটি কোন বিষয়ে লেখা?

২. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ দেয়াল চিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত গ্রামের (পুরুষেরা/মেয়েরা/বালকেরা)।

২.২ মূলত (বৃত্তাকার/সরলরৈখিক/জ্যামিতিক) আকার-আশ্রিত বর্ণসমাবেশেই রচিত হয় সাঁওতালী দেয়ালচিত্রণ।

২.৩ সাধারণত মাটি থেকে (ছ'ফুট/চারফুট/আটফুট) পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি বিস্তৃত হয়।

২.৪ (শালুকটিকে/পদ্মটিকে/গোলাপটিকে) মানভূম দেয়ালচিত্রের প্রতীক বলা হয়।

শব্দার্থ : দেয়ালচিত্র — দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি। চিত্রণ — ছবি, প্রতিকৃতি। পূর্বতন — বিগত। পীঠস্থান — সুপ্রাচীন দেবস্থান বা দেবমন্দির। গৃহাঙ্গন — গৃহ সংলগ্ন আঙিনা। চতুষ্কোণ — চার কোণ বিশিষ্ট। নিকানো — লেপন করা। হরিদ্রাভ — হলদেটে, পীতবর্ণযুক্ত।

৩. **পাঠ থেকে একই অর্থের শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :** ছবি, জোগাড়, পঙ্কজ, পুষ্প, মাটি।
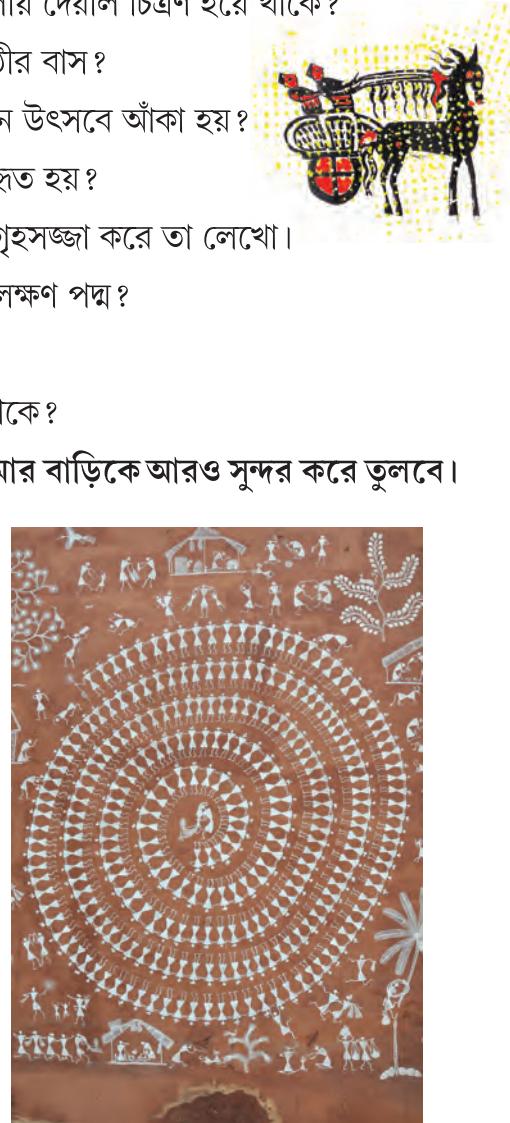
৪. **নীচের বিশেষ্যশব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণশব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

ভৌগোলিক, নির্বাচন, অঞ্চল, রচিত, অলংকার, জ্যামিতি।

৫. তোমাদের এই পাঠ্যাংশ থেকে দুটি জটিল বাক্য লেখো যারা যুক্ত আছে 'যেমন-তেমন' দিয়ে। এছাড়া, 'যদি-তবে', 'যখন-তখন', 'যে-সে', 'যেখানে-সেখানে', 'যেদিন-সেদিন' ইত্যাদি ব্যবহার করে একটি করে জটিল বাক্য লেখো।
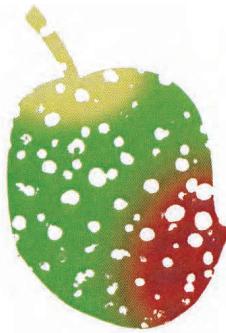
৬. **নীচের বাক্যগুলি জুড়ে একটি বাক্যে পরিণত করো :**

৬.১ এই মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই মাটির রং ঈষৎ সাদাটে।

৬.২ দূর থেকে দৃশ্য হিসেবে মানানসই হওয়া চাই। এই ভাবেই দেয়ালগুলি নির্বাচন করা হয়।

৬.৩ ঘরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে থাকে একটি বেদী। তার রং কালো।

৬.৪ বাংলার কৃষিজীবী সমাজের কিছু প্রাচীন উৎসব আছে। এগুলি হলো গো-বন্দনা, কাঁড়াখুঁটা, গোরুখুঁটা প্রভৃতি।

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ তোমার জানা কোন অঞ্চলের লোকসমাজে দেয়ালে ছবি আঁকার চল আছে?

৭.২ মানভূম জেলা সংলগ্ন আর কোন কোন জেলায় দেয়াল চিত্রণ হয়ে থাকে?

৭.৩ মানভূম জেলায় কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস?

৭.৪ মাটির দেয়াল চিত্রগুলি সাধারণত কোন কোন উৎসবে আঁকা হয়?

৭.৫ দেয়াল চিত্র করার জন্য কী কী উপাদান ব্যবহৃত হয়?

৭.৬ কোন তিথিতে কৃষিজীবীরা কীভাবে তাদের গৃহসজ্জা করে তা লেখো।

৭.৭ কোন কোন জাতির দেয়াল চিত্রের সাধারণ লক্ষণ পদ্ম?

৭.৮ দুধেমাটির ওপর কী ভাবে চিত্রণ করা হয়?

৭.৯ মোরগঝুঁটির চালচিত্রে আর কী কী নকশা থাকে?

৮. **বৃত্তাকার একটি নক্শা বা আলপনা আঁকো যা তোমার বাড়িকে আরও সুন্দর করে তুলবে।**

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ওয়ারলি দেওয়াল চিত্রের একটি নমুনা।

ঝুমুর

দুর্যোধন দাস

মাঘ মাসে সিম মিঠা
খুখড়ির ডিম গো
ফাগুনেতে, মিঠা বাগানের নিম।
চৈত মাসে শ্রীফল মিঠা,
খাঞে ছিল রাম গো
বৈশাখেতে, মিঠা গেঁতি মাছে আম গো॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম মিঠা
আষাঢ়ে কাঁঠাল গো,
বনবাসে, খাল্য কৌশল্যা দুলাল গো॥
দাস দুর্যোধন ভনে,
দহি মিঠা শ্রাবণে,
ভাদর মাসে, মিঠা পাকাতাল দু-গুণ গো॥

দুর্যোধন দাস : ১৮৬১ তে পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডী থানার শ্যামনগর গ্রামে জন্ম। বাবা শত্রুঘ্ন দাস। জমিদার বিচন্দিত সিং-এর দেওয়ান। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর দলে ঢোলবাদক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে ঝুমুর এবং নাচনির তিনজন প্রবাদপুরুষদের মধ্যে একজনে পরিণত হন। বাঘমুণ্ডী রাজবাড়ির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রবাদটি হলো : রামকৃষ্ণের গলা অজমতের চলা দুর্যোধনের বলা।

পিঁপড়ে

অমিয় চক্রবর্তী

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ওই ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক॥
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনল কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নীচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দু-দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে॥

হাতেকলমে

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) : আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। *একমুঠো, পারাপার, পালাবদল, পুষ্পিত ইমেজ, ঘরে ফেরার দিন* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পান।

১.১ অমিয় চক্রবর্তী কোথায় অধ্যাপনা করতেন?

১.২ তাঁর দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

২.১ কবির কী দেখে ‘কেমন যেন চেনা লাগে’ মনে হয়েছে?

২.২ ‘কেমন যেন চেনা লাগে’ — কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২.৩ কবি কাউকে দুঃখ দিতে চাননি কেন?

২.৪ ‘কোন অতলে ডাকুক’ — কে কাকে এই ডাক দেয়?

২.৫ কবি আজ প্রাণের কোন পরিচয় পেয়েছেন?

২.৬ ‘দু দিনের ঘর’ বলতে কী বোঝ?

৩. প্রার্থনা, নির্দেশ, অনুরোধ বোঝাতে বাংলায় ক্রিয়ার শেষে ‘উক’ যোগ হয়। (যেমন এই কবিতায় থাক্ + উক = থাকুক) কবিতা থেকে এমন আরো পাঁচটি শব্দ খুঁজে বের করো।

৪. **নীচের সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ পার্থক্য দেখিয়ে প্রত্যেকটি ব্যবহার করে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা করো।**

ভরে—	ঘরে —	ছুঁয়ে —	আনল —	মধুর —
ভোরে —	ঘোরে—	চুঁয়ে —	অনল —	মেদুর—

৫. **পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো।**

☐	>	পিঁপড়ে	ধুলো	>	☐
মৃত্তিকা	>	☐	যাহারা	>	☐

শব্দঝুড়ি
মাটি, পিপীলিকা
যারা, ধূলা

৬. কবিতা থেকে সর্বনামগুলি খুঁজে বের করে আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহার করো।

৭. **নীচের স্তম্ভদুটি মেলাও:**

বি	দিন
প্রতি	স্মরণ
অ	মধুর
কু	চেনা
সু	কথা

৮. **কবিতা থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি খুঁজে নীচের খোপে যথাস্থানে বসাও :**

সমাপিকা	অসমাপিকা

৯. **দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো :**

মাটির বুকে সবাই আছি এই দু-দিনের ঘরে তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

১০.১ পিঁপড়ের ভাষাহীন চলাচলের মধ্যে বিনিময়ের ভঙ্গিটি কেমন?

১০.২ 'মাটির বুকে যারাই আছি এই দুদিনের ঘরে' — 'এই দু-দিনের ঘরে' বলতে কী বোঝ? কে সবাইকে কীভাবে 'এই দু-দিনের ঘরে' আদরে ঘিরে রাখে?

১০.৩ এই কবিতায় কবির কীরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দাও।

১০.৪ বিভিন্ন রকমের পিঁপড়ে এবং তাদের বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে তোমার পর্যবেক্ষণগুলি একটি খাতায় লেখো। প্রয়োজনে ছবিও আঁকতে পারো।

১০.৫ একটি লাল পিঁপড়ে ও একটি কালো পিঁপড়ের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা করো।

পড়ে দেখো :

গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লালকালো'।

সত্যজিৎ রায়ের 'সদানন্দের খুদে জগৎ'।

ফাঁকি

রাজকিশোর পট্টনায়ক

আটশো টাকা গুণ্ঠ দরে জমি কিনে বাড়ি করার সময়ে বাপে আর ছেলেতে সর্বদা এক কথা—কোথায় বাড়ি হবে। ছেলে বলে, রাস্তার ধারে করা যাক, তাহলে রাস্তা থেকে নামলেই সহজে বাড়িতে ঢোকা যাবে। বাপ বলেন—এমন মরুভূমির মধ্যে কেউ বাড়ি করে না। চারিদিকে পাথরের মতো শক্ত শুকনো মাটি, এর মধ্যে বাড়ি করার মানে কী?

—তাহলে কী করা যায়, বাবা?

—এটুকু জমি খালি রাখা যাক, গাছপালা কিছু—

—হ্যাঁ বাবা, বাগান করব।

—আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে করো।

—কী গাছ?

—আম গাছ পুঁতব এইখানে। কলমি গাছ। আমি একটা কলমি গাছ করেছি— বিরিবাটির বাগানে।

ভালো আম। সেই যে ভাগলপুর থেকে ল্যাংড়া আম আনিয়েছিলাম—মনে নেই তোর?

গোপাল মুখ তুলে সন্দিগ্ধভাবে বাবার দিকে তাকাল। বাবা কী কলম করেছিলেন কে জানে! গাছ কি ভালো হবে? ফুলের বাগান করলে কী সুন্দর হতো।

—বাবা, ফুলের বাগান করলে ভালো হতো না?

—এখানকার মাটি বেলে মাটি। জল দেবারও সুবিধা নেই।

—বাবা, আমি জল দেব।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তুই তো নিজের হাতে জল তুলে চানটুকুও করতে পারিস না! তুই করবি বাগান!

—না বাবা!

—বেশ করবি তো কর। একটা আমগাছ এখানে থাকবে। তুই যত ফুলগাছ লাগাবি লাগা।

আমের চারা আসলো — ছোটো একটি হাঁড়ির মধ্যে। কালো মাটির উপরে একহাত উঁচু আমগাছ। সবশুদ্ধ গণ্ডা আষ্টেক পাতা হলেও হতে পারে।

—বল তো রে, কোথায় পোঁতা হবে।

—বাবা, মাঝখানে পোঁতো। নইলে এর ডালপালা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চলে যাবে, রাস্তার ছেলেরা উৎপাত করবে। গাছের জন্য কোঁদল লাগবে, বাইরের কোঁদল এসে ঘরে ঢুকবে।

—তোর কেবল ওইসব কথা।

বাপের কথায় রাগ করে গোপাল চলে গেল বাড়ির ভিতর— মায়ের কাছে নালিশ করতে।

—দেখো তো মা, বাবা আমগাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন। গাছে আম ফললে পাড়ার ছেলেরা কি আর রাখবে?

—ওগো! আমগাছ ওখানে কেন লাগাচ্ছ? গোপাল এদিকে রাগ করছে।

—ওঃ! তোমার ছেলে কিছু করবে না, খালি—এই আমগাছ হবে, তার ডাল পাঁচিল টপকাবে, রাস্তার ছেলেরা ঝগড়া বাঁধাবে—এইসব! খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একইরকম বুদ্ধি।

—হ্যাঁ, একইরকম বুদ্ধি। ওখানে গাছ লাগানো হবে না।

—আমি বলছি হবে। আমার জমিতে আমি গাছ লাগাব।

—অ্যাঁ, তোমার জমি? জমি আমার। তোমার নামে আছে, না?

—যা পালা বলছি।

মায়ে-পোয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য।—বাবা সব খারাপ করে দিচ্ছেন। বেশ, করুন।

ঝগড়ার ফলে গাছ সরলো—দুই হাত ভেতরের দিকে। জল দেওয়া হলো। জন্তু জানোয়ার ঠেকাবার জন্য কঞ্চি দিয়ে বেড়াবন্দি করা হলো।

সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠে প্রথমেই গেল আমগাছ দেখতে, গাছ নেতিয়ে পড়ে নেই তো? না, বেশ তাজা আছে।

মাকে গোপাল চুপি চুপি বলল—গাছটাকে আর দু-হাত ভেতরে লাগালে কত ভালো হতো।

—আচ্ছা, এখানেই থাক। বাবা ভারি একগুঁয়ে, কী আর করা যাবে?

—মা, আমি কিন্তু এ গাছের কিছু করতে পারব না।

কারো হেপাজতের দরকার হয়নি। আপন চেষ্টাতেই গাছটি বেড়েছে। মা আর ছেলেতে কথা হয় —কলম ঠিক মতো করা হয়নি। সে কথা বাবাকে বলতে গিয়ে দুজনে বকুনি খায়।

সে বাড়ির নিশানা হয়েছে আমগাছটি। কেউ গোপালবাবুকে তার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বোঝান—কাঠজোড়ি নদীর ধার বরাবর পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিমে যেখানে পাঁচিলের মধ্যে আমগাছ দেখবেন সেইখানে আমাদের বাড়ি।

অনেক বন্ধুর কাছে এই দুষ্ট আমগাছটা ছন্নছাড়া স্বভাবের মানুষ গোপালবাবুর সহজ পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। গাছ আপনাআপনি বাড়ছে, আলো বাতাস আর মাটি থেকে সে তার আহার যোগাড় করে বাড়ির পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নদীর ধারে গ্রীষ্মের গরম বাতাস সে তার সবুজ বুক দিয়ে ঠেকায়। কাঠজোড়ি নদীর দিক থেকে ছুটে আসা গরম বালির ঝাপটা আপন দেহ দিয়ে আটকায়। সর্বদা সকলের কাছ থেকে নানা অত্যাচার সহ্য করে সে চুপচাপ আপন মনে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোপাল তার বন্ধুদের এনে সেই আমগাছের তলায় বসায়। সবাই তারিফ করে, বলে এমনি জায়গায় এমনি আমগাছতলায় বসে যত ইচ্ছা বই লেখা যায়। গোপাল খুশি হয়ে বলে—এটা আমাদের পোষা গাছ, তাই এত সুন্দর হয়েছে। গাছ লাগানোর ইতিহাস গোপালের আর মনে ছিল না।

শহর জায়গা। অনেক দূর থেকে লোকের এই আমগাছটির কথা মনে পড়ে। পূজা, বিবাহবাড়ি—সব কাজে গোপালবাবুর কাছে অনুরোধ আসে আমপাতার জন্য, আমের ডালের জন্য।

কেউ চাইতে আসলে গোপালবাবু নিজে এসে গাছের কাছে দাঁড়ান—কচি পাতা নিও না, ওই থাক, এত পাতা গেলে গাছে কি আর ফল ধরবে? কত লোক আসবে, ওই থাক।

এমনি অশেষ সাবধানতার সঙ্গে গোপাল সেই ডাল-পাতা বিলোয়। পোষা আমগাছের পাতাগুলি সব বুঝি গোনাগুনতি হয়ে আছে। বাড়ির সবাইকার এক চিন্তা—গাছে কবে ফল ধরবে?

—এই, দেখেছ? আমগাছে বোল ধরেছে।

—বাঃ, ভালো বোল হয়েছে, সব ডালে। আহা, বোল মোটে যদি না ঝরে পড়ে, কত আম হবে।

—কেমন আম হয় দেখা যাবে।

—জাত আম।

—কে জানে, বাবা তো নিজেই কলম করেছেন। ভালো কলমি গাছ ফার্ম থেকে আনলে হতো না? তা না, নিজেই কলম করেছেন।

—আমরা ও আম খাব না।

—বাবা, আমরা তোমার আমগাছের আম মোটে খাব না। মা বলছে ভালো আম নয়।

—বেশ খেও না। গাছ তো কেঁদে ভাসাবে কিনা তোমরা না খেলে।

কিন্তু সকালে সকলের মুখে উদ্‌বেগ। কুয়াশা হয়েছে। আমের বোল ঝরে যাবে—এই দেখো, বাতাসে মটরদানার মতো বোল ঝরে ঝরে পড়ছে। আগুন লাগানে পিঁপড়েগুলো সব খেয়ে ফেললে।

—আচ্ছা করে ডিডিটি দেব, পিঁপড়ে মরে যাবে।

—আরে, আম হয়েছে— !

বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে গুনতে আরম্ভ করে। অনেকবার গোনা হয়। পাতার আড়ালে আবার কোথায় একটা বাকি রয়ে যায়, হিসেবে ভুল হয়।—দেখো ছেলেরা, গুনে রাখ। দেখা যাবে কটা আম হয় এতখানি বোল থেকে।

পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়ে যায়। ঢিপ ঢাপ ঢিল ছোড়া শুরু হয়।

—এই, নজর রেখো এই ছেলেগুলোর উপরে।

আম হলে কেউ তো খাবেই। দুপুরে নজর রাখা এক কাজ হলো। প্রত্যেকটি আম এক একটি অমূল্য সম্পদ। পাকলেও আমের উপরটা সবুজ রয়েছে। ভেতরকার রং হলদে না হলেও গেরিমাটির রং দেখাচ্ছে। টক না হলেও মিষ্টি নয়। সবাই এক এক ফালি খেয়ে তারিফ করে—বাড়ির হাঁদা ছেলেকে সবাই যেমন আদর করে গায়ে হাত বুলায়।

—আমাদের আম খুন্টুনি দিয়ে পাড়ব। দেখেশুনে পাড়লে নীচে পড়ে থেঁতলে যাবে না।

বাড়ির সবাই মিলে খুব সাবধানে আম পাড়ে।

—আরে দেখেছ! ভালো করে দেখো, কাঠবিড়ালি আর বাদুড়ের চোখ এড়ায় না কোনো আম। আমরা এতজনে মিলে আম পাড়লাম, তবু রোজ কাক বাদুড় কাঠবিড়ালির এঁটো করা আম পড়ছে কোত্থেকে কে জানে! পিঁপড়েও মরেনি, আধখাওয়া আমে ঠিক লেগে আছে।

এত যত্ন করে যে কয়টা আম ঘরে তোলা হয় তার গোনা-গুনতি দুই চারটি করে বিলানো হয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের। বাড়ির সকলের সঙ্গে একেবারে মিলে মিশে গিয়ে আমগাছটি পরিবারের একজনের মতো হয়ে উঠেছে। কেবল তার নাম দেওয়া হয়নি এই যা।

এই যুদ্ধের সময় আমগাছের উপর দিয়ে এক বিপদ যাচ্ছে। উড়োজাহাজ থেকে যদি বোমা পড়ে তবে তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সরকারের লোক ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রেখে গেছে একেবারে আমগাছের গোড়া পর্যন্ত। সেইদিন থেকে গাছ হেলে পড়েছে পূর্ব দিকে। যতই ঠেকো দেওয়া যাক, সিধে হচ্ছে না। কী করা যায়? শিশুকালে টাইফয়েড হলে ছেলে যেমন চিরদিন রুগ্ন থেকে যায়, তেমনি — বোমা তো পড়ল না—ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আমগাছটিকে কমজোর করে দিয়ে গেল। খোঁড়া মানুষের হাতে যেমন লাঠি দেওয়া হয়, হেলে পড়া আমগাছকে একটা পেয়ারা গাছের দো-ফেঁকড়া শক্ত ডাল দিয়ে তেমনি ঠেকো দেওয়া হয়েছে। পিঁপড়ে কাঠবিড়ালি সেইদিক দিয়ে আর একটি পথ খুলে গাছের উপর যাওয়া আসা করছে। লোক এলে গেলে তার গায়ে সাইকেল ঠেসান দেয়।

ফি বছরই সেই এককথা — এ বছর কত আম ফলবে? তিন বছরে একবার ফলন ভালো হয়। গেল বছর হয়েছিল একশো থেকে পাঁচটি কম। এবার দেখা যাক।

কারো হঠাৎ দয়া হলে দুই এক তাল গোবর নয়তো এক ঘটি জল ঢেলে দেয় গাছতলায়। সকলের নজর গাছের পাতার দিকে। এ বছর কাউকে পাতা দেওয়া হবে না, গাছ কাহিল হয়ে যাবে, ফলবে না।

—মা, গাছটা রাস্তার উপরে বড্ডো ঝুঁকে পড়েছে, যেতে আসতে মাথায় লাগে, বৃষ্টির সময়ে পাতার জলে গা ভিজে যায়। কেটে দেব কয়টা ডাল?

—দ্যাখ গোপাল, আমগাছে হাত দিলে ঝগড়া হবে তোতে আমাতে। এমনি শাসানি সত্ত্বেও গোপাল চুপি চুপি কয়েকটা সরু সরু ডাল কেটে ফেলে, কেটে একেবারে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। মা জানবার কী দরকার, রাস্তাটা সাফ হলেই হলো।

তবু গাছটার কত মায়া। তার পাতার আড়ালে সব ক্ষতচিহ্ন সে লুকিয়ে ফেলে। গোপালের মায়ের চোখ তা ঠাহর করতে পারে না। গোপাল গিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় গাছের গায়ে। ঠিক বন্ধুর মতোই গাছ সব কথা লুকিয়ে রেখেছে।

সে বাড়ির একটা অঙ্গ সেই গাছটি, বাইরের লোককে পথ দেখাবার জন্য বাইরের বিজলি আলো জ্বালিয়ে গাছ তা আড়াল করে দেয়। ভেতরের কথা লুকিয়ে রাখে বাইরের লোকের কাছে। বাইরের লোককে আপন আড়ালের ওপাশে রাখে।

কত ঝড় বৃষ্টি গিয়েছে, প্রতি বছর যত ফুল ফল কুঁড়ি ও পাতা সে ফেলেছে আবার ততই এসে ভরেছে। গোপাল বড়ো হয়ে বুড়ো হতে চলল, গোপালের বাবা মা ভাইবোন ভাগনে ভাইপো সকলেই এগোচ্ছে, গাছটির বয়স বাড়ে না। হয়েছে কাছের দালানটার সমান উঁচু। যতখানি জায়গা নিয়েছিল তেমনি রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে মানুষের ছেলেরা ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে বুড়ো হচ্ছে।

প্রতি বছর কাক এসে বাসা বাঁধে। বর্ষাকালে বেনেবৌ এসে বসে। রাতে কাল পেঁচা এসে ডাকে, রোজ কাঠবিড়ালি খেলা করে। ফি বছর ছেলেপিলেরা তাতে দোলনা টাঙায়। তাদের কলরব কল্লোল, তাদের উৎসাহ আনন্দ সেই আমগাছটির গায়ে গোড়ায় লুটিয়ে পড়ে।

প্রত্যেক বছর ঝড় বয়েছে। আমগাছ তাতে কেঁপেছে। তার ডালে-পাতায় পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছের নীচে পিঁপড়ে শিকার করতে পিঁপড়ে-বাঘ বেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থেকেছে। বাতাস তেমনি গাছ জড়িয়ে, ডাল দুলিয়ে বয়ে গেছে। সে গাছ অজর।

গাছ জানে না, বোঝে না। তাকে উপলক্ষ করে যে যা করে, যে যা ভাবে তার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। দোলনা পাছে পড়ে যায় বলে তার গায়ে ভোমর করে মোটা প্যাঁচ আঁটা হয়েছে। মানুষ আর গাছ জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ, কিন্তু দুইই পোষ মানে। পোষা মানুষ কাজের বেলায় কৃতঘ্ন হয়, পোষা গাছ সর্বদা কৃতজ্ঞ আর বাধ্য।

ঝড় আসে, আসবে। তাতে ভাবার কিছু নেই।

সকালবেলা বাড়িতে হইচই।—আরে ! দেখেছ, কাল রাতে আম গাছ ভেঙে পড়ে গেছে!— ভাই, ওঠ! —আরে গোপাল, ওঠ! আমগাছের দশা দেখেছিস?

সবাই ছুটে গেল আমগাছের কাছে। গোপাল দেখল আমগাছ পড়ে আছে মাটির উপরে তার দোলনা বাঁধা দড়ি তার ডালের নীচে চাপা পড়েছে । দাঁড়িয়ে থাকাতে যত উঁচু ছিল, পড়ে গিয়েও তার ডালপালা তত উঁচু হয়েই রয়েছে।

গোপাল ঘুরে ঘুরে দেখল গাছের একটা দিক উইয়ে অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, ফোঁপরা হয়ে গেছে। আর অর্ধেক ভেঙে গেছে।

—কিরে গোপাল, ওষুধ দিয়ে পিঁপড়ে মারছিলি না? পিঁপড়ে থাকলে উই লাগত না। এত বড়ো গাছটাকে উইয়ে খেয়ে ফেললে। গেল —!

—পিঁপড়ে তো মোটে রইল না, উইয়ের রাজত্ব হলো। কাঁচা গাছটাকে ভোজ করে দিলে!

কাঠবিড়ালিগুলো দূরে ঘোরাফেরা করছিল।

—আর কী খাবি রে, কাঠবিড়ালি? আমগাছ মরে গেছে।

নদীতে স্নান করতে আসে-যায় যারা, পথে চলা পথিকেরা দাঁড়িয়ে যায়, বলে—কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড়ো ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!

গাছটা কত ভালো। পড়েছে যে, তা ঘরের উপর পড়েনি। বাড়ির উপরকার বিজলি বাতিটা ভাঙেনি। দিনের বেলা পড়েনি। ডালে কাকের বাসা তেমনি আছে। কালো কালো ছানাগুলো উড়তে শেখেনি, চ্যাঁ চ্যাঁ করছে।

সে গাছ আর নেই। ভারি বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি আর বেঁচে নেই। কাঠুরিয়া এসে কুড়াল দিয়ে গাছের পাবে পাবে টুকরো করে কেটে দিয়ে গেল। পাখির বাসাওলা ডালটি আর একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো।

খবর কাগজে লিখেছিল—কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়ে পড়েছে। গাছটির মৃত্যু-সংবাদ খবর কাগজে বের হলো। কী কপাল জোর তার!

দুই দিন পরে সন্ধ্যাকালে গোপালবাবু কাকে নিজের বাড়ির নিশানা দেবার সময় বলছিলেন—পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিম দিকে গেলে যেখানে প্রথম আমগাছ পাবেন—না না, ভুল বললাম, সে আমগাছটি পড়ে গেছে এই ঝড়ে।

আষাঢ়ের ঝড় আপন পরাক্রম দেখাতে লুটে নিল একটি নিরীহ নিরপরাধ আমগাছকে, তায় আবার সে ছিল দুর্বল, উইয়ে খেয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ির সেই মানুষদের একটি বন্ধু ফাঁকি দিয়ে চলে গেল —সেই ঝড়ের রাতে।

রাজকিশোর পট্টনায়ক (জন্ম ১৯১৬) : ওড়িয়া সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ লেখক ও গল্পকার। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। পেশাতে আইনজীবী। একজন নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধক। আধুনিক জীবনের নর-নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর লেখা বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থগুলি হলো *পথুকি, তুঠ পাথর, ভড়াঘর, নিশান খুন্ট, পথর ঢিমা*। আর উপন্যাসগুলির মধ্যে *অসরন্তি, সিন্দুর গার, স্মৃতির মশাণি, চলাবাট* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য *ফাঁকি* গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার।

১.১ রাজকিশোর পট্টনায়ক কোন ভাষার লেখক?

১.২ তাঁর লেখা দুটি গল্পের বইয়ের নাম লেখো।

২. **সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

সন্দেহ, আষ্টেক, প্রত্যেক, সম্পূর্ণ, নিরপরাধ, দুর্বল।

৩. **প্রতিশব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

বাড়ি, ছেলে, রাস্তা, পাথর, গাছ, বন্ধু, নদী।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া বেছে নিয়ে লেখো :**

৪.১ এটুকু জমি খালি রাখা যাক।

৪.২ আগে গাছ লাগাব।

৪.৩ কোঁদল লাগবে, বাইরের কোঁদল এসে ঘরে ঢুকবে।

৪.৪ মায়ে-পোয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য।

৪.৫ সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠে প্রথমেই গেল আমগাছ দেখতে, গাছ নেতিয়ে পড়েনি তো?

৫. **সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া চিহ্নিত করো :**

৫.১ বাবা আমগাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন।

৫.২ খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একই রকম বুদ্ধি।

৫.৩ আপন চেষ্টাতেই গাছটি বেড়েছে।

৫.৪ জল দেওয়া হলো।

শব্দার্থ : গুণ্ঠ — প্রায় ১৭৪০ বর্গফুট জমি বা এলাকা। সন্দিগ্ধ — সন্দেহযুক্ত। গন্ডা — চারটি। কোঁদল — ঝগড়া, বচসা। ফার্ম — খামার । ঠেকো — ঠেস, পড়ে যাওয়া আটকাতে অবলম্বন দেওয়া। সিধা — সোজা। ফি বছর — প্রতি বছর। কৃতজ্ঞ — উপকারীর উপকার মনে রাখে। পরাক্রম — বীরত্ব, বিক্রম।

৬. গল্প থেকে বেছে নিয়ে পাঁচটি অনুসর্গ লেখো। সেই অনুসর্গগুলি যোগে স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

৭. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো:**
জাহাজ, গাছ, পোষ, ঝড়, পশ্চিম।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৮.১ কটক কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ওড়িশার আরও একটি নদীর নাম লেখো।

৮.২ গোপালের বাবা প্রথমে কেন বাগানে ফুলগাছ লাগাতে চাননি?

৮.৩ আমগাছে কেন ঠেকো দিতে হয়েছিল?

৮.৪ গাছটিকে উইয়ে খেয়ে ফেলল কীভাবে?

৮.৫ গল্প অনুসারে কটকের খবরের কাগজে আমগাছটিকে নিয়ে কী সংবাদ বেরিয়েছিল?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ 'একটু জমি খালি রাখা যাক' — প্রস্তাবটি কে দিয়েছিলেন? কেন তিনি এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

৯.২ 'গোপাল মুখ তুলে সন্দিগ্ধভাবে বাবার মুখের দিকে তাকাল।' — তার এই সন্দেহের কারণ কী?

৯.৩ 'তুই করবি বাগান!' — বাবা কেন এমন মন্তব্য করেন?

৯.৪ 'গাছটাকে আর দু'হাত ভিতরে লাগালে কত ভালো হতো।' — কোন গাছ? কেন বক্তার এমন মনে হয়েছে?

৯.৫ আমগাছটি কীভাবে গোপালবাবুর বাড়ির নিশানা হয়ে উঠেছিল?

৯.৬ গাছটি কীভাবে তাদের সাহায্য করেছিল বুঝিয়ে লেখো।

৯.৭ আমগাছটিকে ঘিরে বাড়ির সকলের অনুভূতির প্রকাশ গল্পে কীভাবে লক্ষ করা যায়?

৯.৮ 'সেই দিন থেকে গাছ হেলে পড়েছে পুবদিকে।' — কোন দিনের কথা বলা হয়েছে। গাছটি হেলে পড়ার কারণ কী?

৯.৯ 'ঠিক বন্ধুর মতই গাছ সব কথা লুকিয়ে রেখেছে।' — গাছটি কীভাবে গোপালের বন্ধু হয়ে উঠেছিল? কোন সব কথা সে লুকিয়ে রেখেছিল?

৯.১০ বিভিন্ন ঋতুতে আমগাছটির যে ছবি গল্পে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৯.১১ গাছটি কীভাবে পরিবারের সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল?

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।

নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।
আকাশি ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

চিত্রগ্রীব
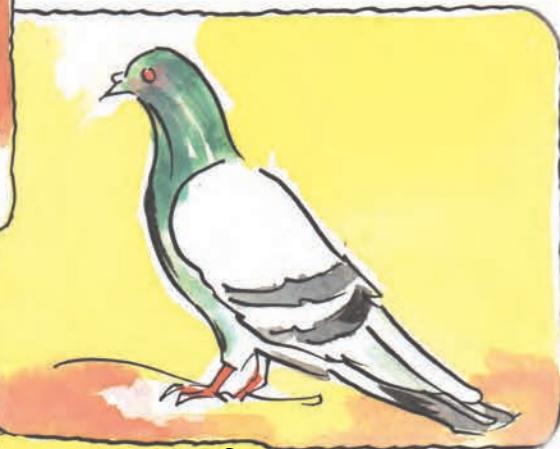
কথা : **ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়**

ছবি : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

আমার এক বন্ধুর নাম ছিল ‘করী’—
সে একটি হাতি।
অপর বন্ধুর নাম ছিল ‘চিত্রগ্রীব’—সে একটি
পায়রা। চিত্রিত বা রঙিন গ্রীবা যার তাকেই বলে
চিত্রগ্রীব।
প্রথমেই চিত্রগ্রীবের মা বাপের কথা বলি
শোনো।
তার বাপ ছিল
এক গেরোবাজ।
সে বিয়ে করেছিল তখনকার এক সেরা সুন্দরী পায়রাকে।
এক পুরানো বনেদি ‘হরকরা’ বংশে সেই সুন্দরীর জন্ম।
চিত্রগ্রীবকে জগতে আনবার জন্য
কবে ঠোঁট দিয়ে ডিমের খোলা
ভেঙে ফেলতে হবে, সে কথা
তার মায়ের অজানা নয়।

বাপ-পাখি যদিও সকাল থেকে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন ডিমে তা দেয়, তবুও সে বোঝে না কখন তার বাচ্চা জন্মাবে।
মা-পাখি ছাড়া আর কেউ সেখবর পায় না। আমরা এখনও বুঝি না কি রকম সেই বেতার খবর, যার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে ডিমের খোলার মধ্যেকার হলদে আর সাদা জিনিস পাখির ছানায় পরিণত হয়েছে।
সে আরো জানে কেমন করে ঠিক জায়গায় ঠোকর দিতে হবে, যাতে করে ডিমের খোলাটি ভেঙে যাবে, অথচ বাচ্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। আমার কাছে এ এক অলৌকিক ব্যাপার।
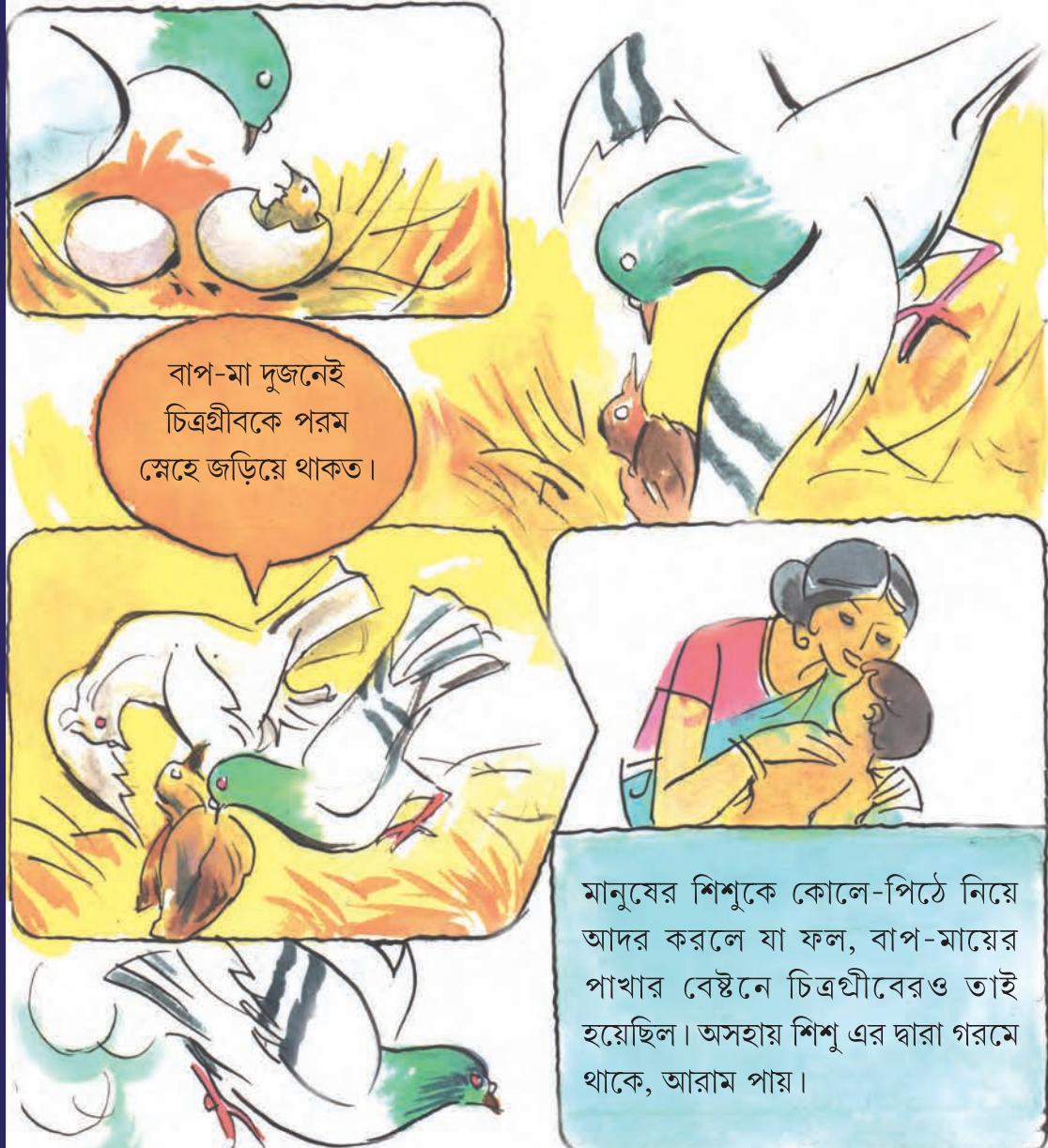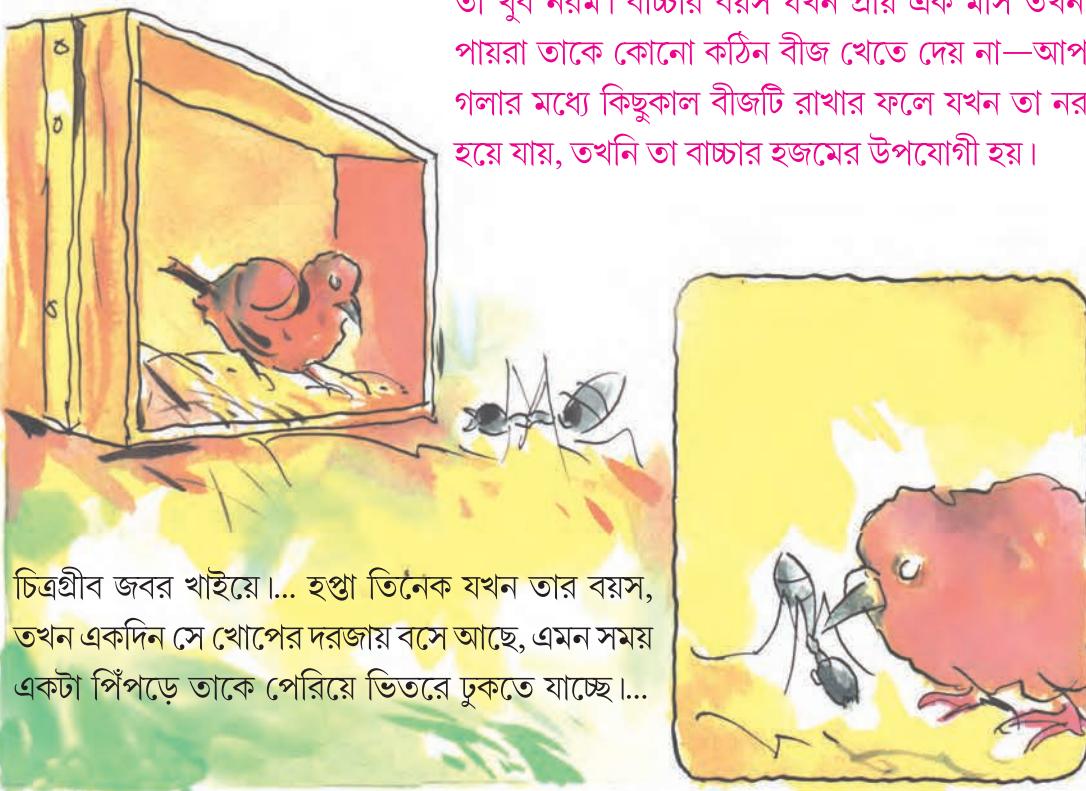
পাখির জগতে দুটি মধুর দৃশ্য আছে। প্রথম—মা যখন ডিম ভেঙে তার বাচ্চাকে প্রকাশ করে; দ্বিতীয়—যখন সে তাকে ডানা দিয়ে জড়িয়ে থাকে আর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।
বাপ-মা দুজনেই চিত্রগ্রীবকে পরম স্নেহে জড়িয়ে থাকত।
মানুষের শিশুকে কোলে-পিঠে নিয়ে আদর করলে যা ফল, বাপ-মায়ের পাখার বেষ্টনে চিত্রগ্রীবেরও তাই হয়েছিল। অসহায় শিশু এর দ্বারা গরমে থাকে, আরাম পায়।
বেশ মনে পড়ে, জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকে যখনই বাপ-মার মধ্যে একজন কেউ খোপের মধ্যে উড়ে আসত, তখন কেমন করে বাচ্চার ঠোঁট দুখানা আপনা আপনি ফাঁক হয়ে যেত;আর তার লাল টুকটুকে দেহ হাপরের মতো ফেঁপে ফুলে উঠত।

তখন বাপ কিংবা মা তার হাঁ-র মধ্যে নিজের ঠোঁট পুরে দিয়ে দুধ ঢেলে দিত।
তাদের খাওয়া ভুট্টা-বীজ সেই দুধে পরিণত হয়েছে।
আমি লক্ষ করলুম—বাচ্চার মুখে যে খাবার ঢেলে দিলো তা খুব নরম। বাচ্চার বয়স যখন প্রায় এক মাস তখনও পায়রা তাকে কোনো কঠিন বীজ খেতে দেয় না—আপন গলার মধ্যে কিছুকাল বীজটি রাখার ফলে যখন তা নরম হয়ে যায়, তখনি তা বাচ্চার হজমের উপযোগী হয়।
চিত্রগ্রীব জবর খাইয়ে।... হপ্তা তিনেক যখন তার বয়স, তখন একদিন সে খোপের দরজায় বসে আছে, এমন সময় একটা পিঁপড়ে তাকে পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে।...

অমনি গোটা পিঁপড়েটা দু-টুকরো হয়ে গেলো।
চিত্রগ্রীব মরা পিঁপড়েটার উপর নাক নামিয়ে আপন কীর্তি লক্ষ করে দেখতে লাগল।... আমরা আশা করতে পারি কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত হলো। যাইহোক জীবনে আর কখনো সে পিঁপড়ে মারেনি।
হপ্তা পাঁচেক বয়সে সে খোপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বার হয়ে খোপের সামনে জলের মালসা থেকে জল খেতে আরম্ভ করলে।

ঠিক সেই সময় আমি এক আবিষ্কার করলুম। আগে জানতুম না পায়রারা কেমন করে আঁধির মধ্যে উড়েও অন্ধ হয় না।
নিয়ত চিত্রগ্রীবের বাপকে লক্ষ করতে করতে একদিন নজরে পড়ল তার চোখের উপরে একটি পাতলা পর্দা। ভাবলুম তার চোখে বুঝি ছানি পড়ছে—সে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে।
আতঙ্কে হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম, তাকে মুখের কাছে টেনে এনে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্য। ... অমনি সে তার সোনালি চোখ খুলে ফেলে খোপের পিছন পানে টুপ করে সরে গেল।
তবুও তাকে আমি চেপে ধরে ছাদের উপর নিয়ে গেলুম। ...
তারপর বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্যের আলোয় তার চোখের পাতা খুব ভালো করে পরখ করলুম। হ্যাঁ, রয়েছে বটে ঘুড়ির কাগজের মতো ফিনফিনে...
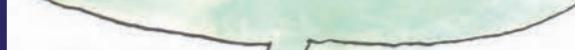
এমনি করে আমি জানতে পারলুম যে এই পর্দাটি তার চোখ রক্ষা করে—এরই সাহায্যে ওই পাখি আঁধির মাঝে বা সোজা সূর্যের পানে উড়তে পারে।

দু’ হপ্তা বাদে চিত্রগ্রীব ওড়ার শিক্ষা পেলে। পাখি হয়ে জন্মালেও সে শিক্ষা খুব সহজ হয়নি।

প্রথম শিক্ষা দেবে তার বাপ-মা---আমিও সাধ্যমত শেখাতে লাগলুম। প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমি তাকে কবজির উপর বসাই।

তারপর হাতখানা অনেকবার উপর নীচে করে দোলাতে থাকি। সেই অস্থির দাঁড়ের উপর আপনাকে স্থির রাখবার চেষ্টায় তাকে ঘনঘন ডানা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়। এতে তার উপকার হয়, কিন্তু আমার শিক্ষা ওখানেই শেষ।

যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার অনেক দিন আগেই তার বাপ ছেলের শিক্ষার ভার নিলে।
সেদিন সারাদিন দখিনা বাতাসে শহরের উপরকার আকাশ তপ্ত হতে পারে নি। সে বাতাস সবে মাত্র থেমেছে। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল—উজ্জ্বল নীলকান্তমণির মতো। চারিদিক এমন পরিষ্কার যে অনেক দূর পর্যন্ত শহরের গৃহচূড়া দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে মাঠ বাগান শস্যক্ষেত্র নজরে পড়েছে।
বেলা প্রায় তিনটের সময় চিত্রগ্রীব ছাতের পাকা পাঁচিলের উপর রোদ পোহাচ্ছিল।
বাপ উড়ে বেড়াচ্ছিল, নেমে এসে ঠিক তার পাশে এসে বসল। ছেলের পানে কেমন এক অদ্ভুত রকমে সে চাইলে, তার মানে যেন—'বলি কুঁড়ের সর্দার, বয়স তো প্রায় তিন মাস হলো, এখনো ওড়বার সাহস হয় না! তুই কী বল দেখি—পায়রা না কেঁচো?'

কিন্তু গাম্ভীর্যের অবতার চিত্রগ্রীব কোনো
জবাব দিলে না—স্থির হয়ে বসে রইল।
দেখে বাপের অসহ্য বোধ হলো,
সে পায়রার ভাষায়
বক্-বক্-কুম করে ছেলেকে
ভর্ৎসনা করতে লাগল।
বকুনি এড়াবার জন্য
চিত্রগ্রীব
যতই সরে বসে, বাপও
ততই এগিয়ে যায় ডানার
ঝাপট দিয়ে—বক্-
বকানিও থামে না।
চিত্রগ্রীব কেবলই সরে সরে বসতে লাগল, বুড়ো কিন্তু
তাতে নিরস্ত হলো না, সে-ও তার সঙ্গে লেগেই রইল,
বকুনির মাত্রাও বেড়ে গেল। ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে
পাঁচিলের শেষ প্রান্তে এমন জায়গায় উপস্থিত করলে
যে উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোনো
উপায় রইল না।
চিত্রগ্রীবের পা ফসকে গেল, আধ ফুট
পড়তে না পড়তেই সে তার ডানা
মেলে উড়তে শুরু করলে।

সকলের পক্ষেই কী আনন্দের কথা!
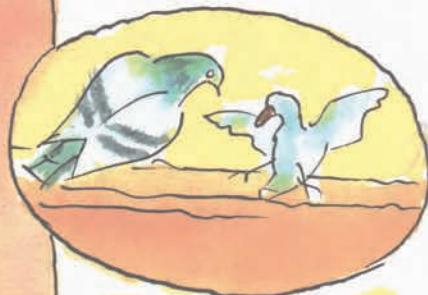
তার মা নীচে জলে ডুব দিয়ে বৈকালের প্রসাধন সম্পন্ন করছিল ...

ব্যাপার দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ছেলের সঙ্গে উড়তে শুরু করলে। ছাতের উপর অন্তত মিনিট দশেক চক্রাকারে উড়ে তারা নেমে এল।

ছাদে পৌঁছে মা দস্তুরমাফিক ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল। কিন্তু চিত্রগ্রীবের কথা অন্য; ছোটো ছেলে ঠান্ডা গভীর জলে গিয়ে পড়লে যেমন ভয় পায়, তারও তেমনি অবস্থা। তার সারা দেহ কাঁপছে, নেমে এসেও ছাতের উপর পা পাততে পারছে না, তাল সামলাবার জন্য ডানা ঝটপট করে সে পিছলে বেড়াতে লাগল— পায়ে যেন চাকা বাঁধা আছে। ... উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে। ...

তার মা এগিয়ে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল... কাজ ঠিক মতো সম্পন্ন হয়েছে বুঝে চিত্রগ্রীবের বাপ তৃপ্ত মনে স্নান করতে নেমে গেল।

হা
তে
ক
ল
মে

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) : প্রথম জীবনে সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থায় উদবুদ্ধ হয়ে বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের জন্য জাপানে যান। সেখান থেকে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিনদেশে যান। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য বিষয়ে বি.এ. পাশ করেন। তারপরেই লেখালিখির শুরু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *Gay Neck* (*চিত্রগ্রীব*) বইটির জন্য *জন নিউবেরি* পদক লাভ করেন। এরপর শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই *Kari: the Elephant, Hari: the Jungle lad, The Chief of the Herd* (*যূথপতি*) প্রভৃতি।

১.১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কোন বইয়ের চিত্ররূপ তুমি পড়লে?

১.২ তাঁর লেখা অন্য আর একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. ‘চিত্রগ্রীব’ নামক ছবিতে গল্পটি পড়ে চিত্রগ্রীবের বাবা ও মায়ের আচরণ তোমার কেমন লাগল কয়েকটি বাক্যে লেখো। বাবা-মায়ের সাহচর্যে চিত্রগ্রীব যেমন উড়তে শিখেছে, ঠিক তেমন কোন শিক্ষা তুমি প্রথম বাবা-মায়ের সাহচর্যে শিখেছ—মনে করে লেখো।

৩. তোমরা ‘চিত্রগ্রীব’ নামের পায়রাটির উড়তে শেখার কথা জানলে। তুমি কখনও টিয়া বা চন্দনার মতো এমন কোনো পাখি দেখেছ যারা কথা বলতে পারে? যদি এই ধরনের কোনো পাখির সঙ্গে তোমার ভাব হয়, তাহলে তুমি তার সঙ্গে কী কথা বলবে? তোমাদের সেই কাল্পনিক সংলাপটি সংক্ষেপে লেখো।

৪. ‘চিত্রগ্রীব’ যেমন একটি ছবিতে গল্প ঠিক এই রকমের একটি ছবিতে গল্প বন্ধুরা মিলে ‘কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি’ বা ‘সেনাপতি শংকর’ রচনাংশটি অবলম্বনে তৈরি করে দেখতে পারো।

আশীর্বাদ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বর্ষা খুব নেমেছে। নীচেও ডেকেছে বান। জলে দেশ থইথই করছে।

একটি পিঁপড়ে আশ্রয় নিয়েছে একটি ঘাসের পাতার নীচে।

পাতাটা কাঁপছে। হেলে পড়ছে। বৃষ্টির ফোঁটার ঘায়ে পাতাটা বোধহয় এলিয়ে পড়বে জলে। আর একটুকুতেই, পিঁপড়েটা, অসীম জলে ভেসে যাবে-যাবে হয়েছে।

পাতা বললে—'ভাই, জোরে আঁকড়ে ধরো। কামড়ে ধরো আমাকে; আমার লাগবে না। ভয় পেয়ো না, তোমরা তো সাঁতার জানো, হেঁটে, দৌড়েও চলো, তোমাদের আবার কী?

পাতার শিরা কামড়ে ধ'রে পিঁপড়ে আধ-গলায় বললে—'দেখো, শরীরটা জলে ডুবে গেল, দাঁড়াও ভাই, বলছি।'

এক ঢোঁক জল খেয়ে পিঁপড়ে আর কিছু বলতে পারলে না। চোখ বুজে পাতাতে দাঁত বসিয়ে, ডুবু-ডুবু হয়ে ঝুলে রইল।

পাতা হাসলে—'ভাই, ভাগ্যে তুমি জিমনাস্টিকস জানতে। আমরা নড়তেও পারিনে। কোনোরকমে শুঁড়-টুড় বাড়াই। চলতেই জানলেম না, তা, ঝুলব কোথায় গিয়ে?'

বৃষ্টি একটু ধরল। ঘাসের পাতাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কামড় আর নিশ্বাস ছেড়ে, পিঁপড়ে বললে—'বাপ! বাঁচলেম ! বলছিলে ভাই, ঠিক। আমরা সাঁতার জানি; হাঁটতে জানি, দৌড়োতেও খুব। দুত্তোর। কাজে আসে না কোনোটাই। ডাঙায় রোদ্দুরের দিনে পুড়ে মরি, বর্ষায় তুমি ছিলে তাই আজ বেঁচে গেলাম—'

—'ও কথা বলে লজ্জা দিও না।' হাতে হাত দিয়ে ধরে বললে পাতা। 'বাঁচন আর মরণ নাকি একটা কথা? তুমি যে কাজের লোক ভাই! ওইটেই আসল।'

শুনে, বর্ষাতেও পিঁপড়ের মুখ শুকিয়ে গেল! ভিজে শরীরে শুকনো মুখে সে বললে—'ভাই, কাজ তো করিই। সারা দিন-রাত খাটি। খাটি। খাটি। শুধু খাই। দাই। থাকি গর্তে। তোমরা পৃথিবীর উপরে হাসো, ফুলটুল ফুটাও। আমরা যাই, আসি, দেখি। ছাই ও-কাজ। শেষে আবার সেই গর্তেই ঢুকি গিয়ে। বুঝি ভাই, মাটি আমাদের, পৃথিবীটা তোমাদের।'

শিউরে পাতা বললে— 'ভাই, অমন কথা বোলো না; মাটি সবারই। থইথই যে জল, মাটি না থাকলে চলত কোথা দিয়ে?'

পিঁপড়েও শিউরোল—'হায় ! এ জল কী করে পার হব?'

বৃষ্টি ঝম-ঝম করে এল। তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে আবার কামড়ে ধরলে পাতা।

বৃষ্টি দাঁড়াল। 'ভাই, শুনেছিলাম তোমাদের কথা। মেঘের আড়াল থেকেও শুনেছি। পিঁপড়ে ভাই, বড্ড তোমার ভয়? না? কিন্তু ওই পাতা বন্ধুটিকে আমি কোনোদিন ভয় পেতে দেখিনি। আমরা চলে যাই বিদেশে, ফিরে এসে দেখি, রোদ্দুরে পুড়ে বন্ধুর দল ধুলো হয়ে আছে। যেই দি ডাক, আর, ধুলো ঝেড়ে সারা দেশে সবুজ হয়ে ওঠে সবুজ পাতা চিরদিন। আমি আনন্দে গান গেয়ে উঠি সবুজ বন্ধুর হাত ধরে।'

খল খল করে হেসে উঠল জল, ঢেউ তুলে —'তুমি গান গাচ্ছ, আমিও গাই। বর্ষায় যে ঘাসকে আমি ডুবিয়ে, কাদায় লুটিয়ে, তলিয়ে দিয়ে ছুটি, শরতে চেয়ে দেখি, তারাই কাশবন হয়ে হাসছে!'

ঘাসের পাতা আস্তে মাথা নোয়ালে হাওয়ায়।

পিঁপড়ে জড়িয়ে ধরল পাতার শিরা। বুক ভেঙে নিশ্বাস পড়ল পিঁপড়ের। হায়! পিঁপড়ে আমি চিরদিন পিঁপড়ে হয়েই রইলেম! তবু ছিলেম গর্তে, ছিলেম ডাঙায়। এ জল কি শুকুবে কোনো দিন?

ঘাসের পাতা মাথা নুইয়েই ছিল। এবারে মাথা একটু তুলল। তারপর বললে পিঁপড়ের কানে কানে—'বন্ধু, ভাই, ভয় তুমি পেয়ো না। ভেবো না একটুও। বাদল চলে যাবে, চলে যাবে এ জল নিশ্চয়। আসবে। আসবেই। আসছে শরৎ।'

পৃথিবী তোমার হবে।

পিঁপড়ে চোখ তুললে। আহা, পৃথিবী কি আবার তার হবে! পিঁপড়ের চোখে জল, আসতে আসতে, থামল।

চেয়ে সে দেখলে, মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের চোখও হাসছে।

হবেই। আশীর্বাদ করি, শরতের আশীর্বাদ তোমাদেরও উপরে ঝরুক।

পৃথিবী সবারই হোক।

হাতেকলমে

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭—১৯৫৬) : বাংলাদেশের ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে বিখ্যাত মিত্র মজুমদার বংশে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *উত্থান*। কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত রূপকথা, উপকথা ও লোককথার গল্প। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখের গল্পকথাকে সংগ্রহ করে নিজের মতো করে মূল কাহিনিটি লিখতেন। দক্ষিণারঞ্জন ১৯৩০-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ*-এর সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির নাম — *ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, উৎপল ও রবি, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, চিরদিনের রূপকথা* ইত্যাদি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় শিশু সাহিত্য পরিষদ* তাঁকে *ভুবনেশ্বরী পদক* দিয়ে সম্মানিত করেন।

১.১ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি কী আকর্ষণ করত?

১.২ তিনি শিশুসাহিত্যের কোন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ বন্যায় প্রকৃতির রূপ কেমন হয়?

২.২ পিঁপড়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?

২.৩ বৃষ্টির সময়ে গাছের পাতা কাঁপছিল কেন?

২.৪ পিঁপড়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কী করল?

২.৫ পিঁপড়ে কখন ‘বাপ! বাঁচলেম’ বলে উঠল?

২.৬ জল কেমন শব্দে হেসে উঠেছিল?

২.৭ ‘বুক ভেঙে নিশ্বাস পড়ল পিঁপড়ের।’—কেন এমন হলো?

২.৮ ‘শরতের আশীর্বাদ তোমাদেরও উপরে ঝরুক।’— কে এমনটি কামনা করেছিল?

৩. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করে লেখো:**

৩.১ বর্ষা খুব নেমেছে।

৩.২ ভাই, জোরে আঁকড়ে ধরো।

৩.৩ এক ঢোঁক জল খেয়ে পিঁপড়ে আর কিছু বলতে পারলে না।

৩.৪ বৃষ্টির ফোঁটার ঘায়ে পাতাটা বোধ হয় এলিয়ে পড়বে জলে।

৩.৫ শিউরে পাতা বললে— ‘ভাই, তেমন কথা বোলো না।’

৪. সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া চিহ্নিত করো :

৪.১ সারা দিন রাত খাটি।

৪.২ আমরা যাই, আসি, দেখি।

৪.৩ ঘাসের পাতাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৪ এ জল কী করে পার হব?

৪.৫ পৃথিবী তোমার হবে।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো : নিশ্বাস, বৃষ্টি, নিশ্চয়, আশীর্বাদ।

শব্দার্থ : বান — বন্যা। অসীম — সীমাহীন। জিমনাস্টিক — শরীরচর্চা, ব্যায়াম, শারীরিক কসরৎ। আশীর্বাদ — বর।

৬. নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করো এবং তা দিয়ে দুটি নতুন শব্দ তৈরি করো :

বিদেশ, দুর্ভাগ্য, অনাবৃষ্টি, সুদিন, নির্ভয়।

৭. নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে লেখো : আশ্রয় , শরীর , শরৎ , মুখ , ফুল।

৮. ‘চোখ’ শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পৃথক বাক্য রচনা করো।

৯. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও ঃ

৯.১ আমরা সাঁতার জানি।

৯.২ বর্ষাতেও পিঁপড়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

৯.৩ শেষে আবার সেই গর্তেই ঢুকি গিয়ে।

৯.৪ খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠল জল।

৯.৫ পৃথিবী সবারই হোক।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১০. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

১০.১ আমরা সাঁতার জানি। আমরা হাঁটতে জানি। (‘এবং’ দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.২ তোমরা পৃথিবীর উপরে হাসো , ফুলটুল ফুটাও। (দুটো বাক্যে ভেঙে লেখো।)

১০.৩ বর্ষা খুব নেমেছে। নীচেও ডেকেছে বান। (‘যখন-তখন’ দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.৪ আমরা নড়তেও পারি নে। কোনোরকমে শুঁড়-টুড় বাড়াই। (‘কিন্তু’ অব্যয়টি দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.৫ এক ঢোঁক জল খেল এবং পিঁপড়ে কিছু বলতে পারলে না। (‘এবং’ অব্যয়টি তুলে দিয়ে বাক্যদুটিকে একটি বাক্যে লেখো।)

১১. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :
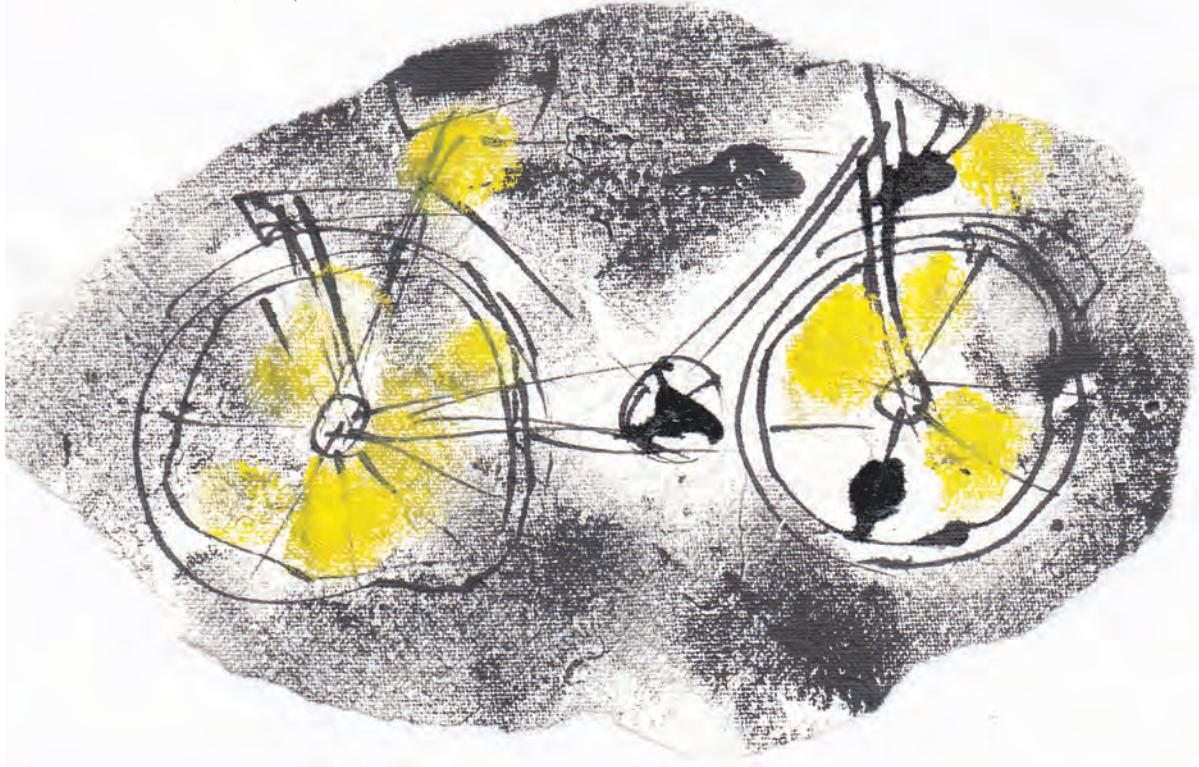
১১.১ পাঠ্যাংশে কোন কোন ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে? প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১১.২ পাতা গাছের কী প্রয়োজনে লাগে?

১১.৩ পিঁপড়ের বাসস্থান সম্পর্কে অনধিক তিনটি বাক্য লেখো।

১১.৪ বৃষ্টি পাতাকে কোন পরিচয়ে পরিচায়িত করেছে?

১১.৫ সবার কথা শুনে পিঁপড়ে কী ভাবল?

১১.৬ প্রকৃতির বুকে শরতের আশীর্বাদ কীভাবে ঝরে পড়ে?

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ বৃষ্টির সময় তোমার চারপাশের প্রকৃতি কেমন রূপ নেয় সে সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

১২.২ পিঁপড়ে গাছের পাতায় আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

১২.৩ পাতা কেন পিঁপড়েকে তার শরীর কামড়ে ধরতে বলেছিল?

১২.৪ পাতা কী বলে পিঁপড়েকে প্রবোধ দিতে চেয়েছিল? 'কাজে আসে না কোনোটাই'— এখানে তার কোন কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে?

১২.৫ 'তাই আজ বেঁচে গেলাম'— বক্তার 'আজ' বেঁচে যাওয়ার কারণ কী?

১২.৬ পিঁপড়ে আর পাতা কীভাবে নিজেদের কষ্টের কথা গল্পে বলেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লেখো।

১২.৭ পিঁপড়ের সঙ্গে গাছের কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ তৈরি করো। শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ের আয়োজন করো।

১২.৮ 'মাটি সবারই'— পাতার এই কথার মধ্যে দিয়ে কোন সত্য ফুটে উঠেছে?

১২.৯ মেঘের আড়াল থেকে বৃষ্টি কোন কথা শুনতে পেয়েছিল? তা শুনে বৃষ্টি পিঁপড়েকে কী বলল?

১২.১০ শরৎ ঋতুর প্রকৃতি কেমন সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

১২.১১ পাতা, বৃষ্টি, জল, ঘাসের পাতা কে কীভাবে পিঁপড়ের মনে সাহস জুগিয়েছিল— তা আলোচনা করো।

এক ভূতুড়ে কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

ভূত বলে কিছু আছে? যদি থাকে তো তিনি আমাকে কখনও দেখা দেননি। তাঁর দয়া, এবং আমার ধন্যবাদ। কৃপা করে দর্শন দিলে আমি তাঁকে দেখতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ভূতদের রূপগুণে আমার কোনো মোহ নেই। তাছাড়া আমার হার্ট খুব উইক। আর শুনেছি যে ওরা ভারি উইকেড—

তবে ভূত কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু অদ্ভুত একটা কিছু একবার আমি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম রাঁচিতে। না, পাগলা গারদে নয়, তার বাইরে— সরকারি রাস্তায়। রাঁচির রাজপথ না হলেও সেটা বেশ দরাজ পথ। কী করে দেখলাম বলি।

একটা পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুড্রুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়— একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ। জায়গাটাও জংলি। আরও মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মতো একটা পাওয়া যেত— কিন্তু সাইকেল ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হলেই হয়েছে! এমনকী, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কিনা আমার সন্দেহ ছিল। হাঁটতে হবে আগে জানলে হাতে পেয়েও সাইকেলে আমি পা দিতাম না নিশ্চয়।

তখনও সন্ধে হয়নি। এই - হব - হব। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত—দু দিকেই সমান পাল্লা। কোন দিকে হাঁটন দেবো হাঁ করে ভাবছি। শেষ পর্যন্ত কী হাঁটতেই হবে? এই একই প্রশ্ন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পুনঃপুনঃ আমার মানসপটে উদিত হয়েছে। আর এর একমাত্র উত্তর আমি দিয়েছি— না বাবা, প্রাণ থাকতে নয়!

অবশ্যি, একরকম স্থানে আর এহেন অবস্থায় প্রাণ বেশিক্ষণ থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয় ছিল। সন্ধে উৎরে গিয়ে বাঁকা চাঁদের ফিকে আলো দেখা দিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত এধারে বাঘের উপদ্রব শোনা গেছল। কখন হালুম শুনব কে জানে!

তবু, চিরদিনই আমি আশাবাদী। সমস্যার সমাধান কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। অচিরেই ঘটল বলে। দু-এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল এবং সেই অভাবনীয়ের সুযোগ নিয়ে সহজেই আমি উদ্ধার লাভ করব।

এরকমটা ঘটেই থাকে, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কত গল্পের বইয়ের এরূপ ঘটতে দেখা গেছে আমার নিজেরই কত গল্পে এরকম দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই আর স্বয়ং লেখক হয়ে আমি নিজে আজ বিপদের মুখে পড়েছি বলে সেই সব অঘটনগুলো ঘটবে না? কোনো গল্পের নায়ক কি কখনও বাঘের পেটে গেছে? তবে একজন গল্পলেখকই বা কোন দুঃখে যাবে শুনি?

সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের অপেক্ষায় আরও আধ ঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে একটা ঘটনার মতো দেখা দিলো বটে। একখানা লরি। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচির দিকে যাচ্ছিল লরিটা।

আমার টর্চ বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার ওপর কুয়াশার পর্দা পড়েছে— এই ঘোরালো আবহাওয়ার মধ্যে আমার আলোর ঘূর্ণিপাক লরির ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়।

লরিটা এসে পৌঁছল—এল একেবারে সামনাসামনি, মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামল না। যেমন এল তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা। আলোর আন্দোলন করতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছল। ছ্যা ছ্যা! শেষটা কি হাঁটাই আছে কপালে? এই ঝাপসা আলো আর কুয়াশার মধ্যে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা। — ভাবতেই আমার বুকটা দুর দুর করতে থাকে। তারচেয়ে বাঘের পেটের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের শর্টকাট।

না-না! কোথাও যেতে হবে না— বাঘের পেটেও নয়। কিছু না কিছু একটা হতে বাধ্য — অনতিবিলম্বেই হচ্ছে! আর এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল!

এর মধ্যে কুয়াশা আরো জমেছে, চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরো। আমি নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি, এমন সময়ে দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াশা ভেদ করে আসতে দেখা গেল। বাঘ নাকি? ... না, বাঘ নয় — দুই চোখের অতখানি ফারাক থেকেই বোঝা যায়। বাঘের দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম উদার হতে

পারে না। আবার আমি বাহুবলে টর্চ ঘোরাতে লাগলাম। ছোট্ট একটা বেবি অস্টিন — তারই কটাক্ষ! আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা — এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধ হয় ওর চেয়ে জোর চলতে পারে।

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল। আমি হাঁকলাম — এই।

কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই! তেমনি মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলতে লাগল গাড়িটা। আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

না, আর দেরি করা চলে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এসপার ওসপার যা হোক! গাড়ি মালিকের না হয় ভদ্রতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে!

অগত্যা, আগায়মান গাড়ির গায়ে গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, নিরাপদও না; কিন্তু কী করব, এক মিনিটও সময় নষ্ট করার ছিল না। কায়দা করে উঠতে হলো কোনোগতিকে। কে জানে, এই হয়ত সশরীরে রাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ!

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে থাকল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্রে বাঘের পেটে না যাই, — (বাঘেরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে। সাইকেলের মালিককে আগামীকাল এক সময়ে জানালেই হবে — বেশি বলতে হবে না — খবর দেওয়া মাত্র তিনি নিজেই এসে নিয়ে যাবেন।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেছি! বসে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলতে গেছি — ‘ আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ডাক্তার যদুগোপালের বাড়ির — ’

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উবে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম— আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমার শার্টের কলারটা মনে হলো যেন আমার গলার চারধারে চেপে বসেছে। হাত তুলে যে গলার কাছটা আলগা করব সে ক্ষমতা নেই। আঙুলগুলো অব্দি অবশ। সেই শীতের রাত্রেও সারা গায়ে আমার ঘাম দিয়েছে। যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ নেই। একদম ফাঁকা, আমি তাকিয়ে দেখলাম। জিভ আমার টাকরায় আটকে ছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাক্‌শক্তি ফিরে পেলাম। ‘ভূত! ভূত ছাড়া কিছু না!’ আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করল তা মনে হলো না। বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

কিন্তু তাহলেও এমন অভূতপূর্ব অবস্থায় আমায় পড়তে হবে ভাবিনি।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এইকথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ায় আরাম বেশি বিবেচনা করে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভূতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম। আলস্যের সঙ্গে আমি কোনোদিনই পারি না; চেষ্টা করলে হয়ত বা কায়ক্লেশে পারা যায়; কিন্তু পেরে লাভ? লাভ তো ডিমের! চিরকালের মতো এবারও

আমার আলস্যই জয়ী হলো শেষটায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে গাড়িটা একটা লেভেল-ক্রসিংয়ের মুখে পৌঁছেছে। ক্রসিংএর গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁশ হলো আমার। হুস হুস করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ! রেলগাড়ির আগমনী কানে আসতেই আমি চমকে উঠলাম। আপ কিংবা ডাউন — একটা গাড়ি এসে পড়ল বলে — অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে— কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো উৎসাহ নেই! ... বিনে ভাড়ায় গাড়ি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি? নিঃশব্দ রাত্রির শান্তিভঙ্গ করে গমগম করতে করতে ছুটে আসছিল ট্রেনটা। তার জ্বলন্ত চোখে মৃত্যুদূতের হাতছানি!

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায়? — এক্ষুনি নেমে পড়া দরকার — আরেক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে।

কোনো রকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়িও থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটাও গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুস হুস করে ট্রেনটা চলে যাবার পর আমার হুঁশ হলো।

নাঃ মারা যাইনি — হুঁশিয়ার হয়ে দেখলাম। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনও এবং মোটরগাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই ছবির মতন দাঁড়িয়ে —

আমার এবং মোটরটার টিকে থাকা একটা চূড়ান্ত রহস্য মনে হচ্ছে — এমন সময় চোখে চশমা-লাগান একটা লোক বেরিয়ে এল মোটরের পেছন থেকে।

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?' এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক — 'দয়া করে যদি আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দ্যান মশাই। আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সেখান থেকে একলাই এটাকে ঠেলতে ঠেলতে আসছি! সারা পথে একজনকেও পেলাম না যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সঙ্গে হাত লাগান। লাইনটা পেরিয়েই আমার বাড়ি, একটু গেলেই। ওই যে, দেখা যাচ্ছে — আর এক মিনিটের রাস্তা।'

হা
তে
ক
ল
মে

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) : পোশাকি নাম চঞ্চল। লেখার ক্ষেত্রে শিবরাম নামেই পরিচিত। বাংলা রম্যরচনা ও মজার গল্পে তিনি অগ্রগণ্য। *বাড়ি থেকে পালিয়ে, হাসির টেক্কা, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন, মস্কো বনাম পন্ডিচেরি, ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা* তাঁর বিখ্যাত বই।

১.১ শিবরাম চক্রবর্তীর পোশাকি নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের বাক্যগুলি কী ধরনের (সরল/যৌগিক/জটিল) তা নির্দেশ করো:**

২.১ ভূত বলে কিছু আছে?

২.২ যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

২.৩ একটা পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুড্ডুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম কিন্তু মাইল সাতেক না যেতে যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল।

২.৪ আমার টর্চবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম।

২.৫ যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ নেই।

৩. **নীচের বাক্যগুলিতে কী কী অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে লেখো :**

৩.১ সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে !

৩.২ কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলাম।

৩.৩ তার চেয়ে বাঘের পেটের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের শর্টকাট।

৩.৪ আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল।

৪. **নীচের বাক্যগুলিকে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ডে ভাগ করো :**

৪.১ আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

৪.২ দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

৪.৩ চিরদিনই আমি আশাবাদী।

৪.৪ এগিয়ে এস বললেন ভদ্রলোক।

৫. **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে থেকে সন্ধিবদ্ধ শব্দ বেছে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

৫.১ কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই!

৫.২ আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

৫.৩ শেষপর্যন্ত আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা।

৫.৪ কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে।

শব্দার্থ : দরাজ — ব্যাপ্ত। পরস্মৈপদী — এখানে 'অন্যের' বোঝানো হয়েছে। পাল্লা — তুলনা, প্রতিযোগিতা। মানসপটে — মনের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবী — যা নিশ্চয় হবে। বেবি অস্টিন — অস্টিন কোম্পানির ছোটো গাড়ি। উইকেড — দুষ্টু ও ক্ষতিকর।

৬. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ 'সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে!' — লেখকের গন্তব্য কোথায়? সাইকেল ঘাড়ে করে যাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে কেন?

৬.২ 'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়' — প্রবাদটির মর্মার্থ কী? একই ভাব বোঝাতে তুমি আরেকটি প্রবাদ উল্লেখ করো।

৬.৩ 'চিরদিনই আমি আশাবাদী' — এই আশাবাদের গুণে লেখক কীভাবে পুরস্কৃত হলেন?

৭. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৭.১ 'অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা' — কোন ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিটির অবতারণা? 'টর্চ' আর 'টর্চার' শব্দের প্রয়োগে যে শব্দ নিয়ে খেলা তৈরি হয়েছে, গল্প থেকে খুঁজে এমন কয়েকটি উদাহরণ দাও। তুমি নিজে এ জাতীয় কয়েকটি বাক্য লেখো।

৭.২ গল্প অনুসরণে সেই নির্জন বনপথে লেখকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৭.৩ 'বাঘের দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম উদার হতে পারে না।' — কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে? লেখকের কাছে সেই 'দৃষ্টিভঙ্গি' কতটা উদারতা নিয়ে এসেছিল, তা বুঝিয়ে দাও।

৭.৪ 'এই হয়ত সশরীরে রাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ।' — কোন সুযোগের কথা বলা হয়েছে? লেখক কীভাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগালেন?

৭.৫ 'আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম' — লেখক কেন তার কথা অসমাপ্ত রেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন?

৭.৬ 'বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল' — 'বে-ড্রাইভার গাড়ি' চলার প্রকৃত কারণটি কীভাবে গল্পে উন্মোচিত হলো?

৭.৭ 'এবারও আমার আলস্যই জয়ী হলো শেষটায়।' — গল্প অনুসরণে লেখকের উৎকণ্ঠা, আলস্য ও কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত দাও।

৭.৮ শেষ পর্যন্ত লেখক সেই 'বেবি অস্টিন' থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কেন? এরপরে তিনি কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন?

৮. তোমার কোনো গা-ছমছমে অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুর কাছে একটি চিঠিতে লেখো।

বাঘ!

নবনীতা দেবসেন

এক যে ছিল ছোট্ট হলুদ বাঘ
তাদের পাখিরালয় বাসা।
তার মনে মনে জমছে কেবল রাগ —
কেন, বনটা কেবল পাখি দিয়েই ঠাসা?

মা-বাবা তার বেছেছেন এই বন
নেই যেখানে ছাগল হরিণ ভেড়া;
ধরবে বা কী? খাবেই বা কী? কোন
ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা?

বাঘছানা কি ধরতে পারে পাখি?
যতই বাড়াক সব্বোনেশে থাবা
পাখির সঙ্গে পেরে উঠবে নাকি?
এক মিনিটেই আকাশপথে হাওয়া!

ছোট্ট বাঘের ছোট্ট শরীর যত
লাফিয়ে ওঠে, ধরতে পাখির ছানা,
পাখিরা সব কিচমিচিয়ে তত
উড়ে পালায় ছড়িয়ে দিয়ে ডানা।

ছোট্ট বাঘের বড্ড খিদে পেটে।
কী আর করে, গেল নদীর পাড়ে।
লালঠেঙো সব কাঁকড়া বেড়ায় হেঁটে,
লম্বা থাবায় ধরতে যদি পারে।

বাঘের ছানা জানত না তো মোটে
কাঁকড়া কেমন চিমটে ধরে দাঁড়া-য়
গর্তে থাবা দিয়েই কেঁদে ওঠে—
'ওরে ব্বাবা! কে আমাকে ছাড়ায়?'

ছোট্ট বাঘের মস্ত হলুদ বাবা
কান্না শুনে দৌড়ে এলেন ঘাটে,
বাড়িয়ে দিলেন গোবদা নখের থাবা
এক থাবড়ায় কাঁকড়া-দাঁড়া কাটে।

খিদের পেটে বাঘের ছানা যখন
ধরতে গেল কাদায় মেনিমৎস্য—
বাঘজননী লজ্জা পেলেন তখন
—'ভোঁদড় তো নোস, ব্যাঘ্র যে তুই, বৎস!'

ছানার দুঃখে দুঃখু পেয়ে ভারি
বাঘ বাবা-মা বদলে নিলেন বাড়ি
সেই থেকে বাঘ যায় না পাখিরালয়
সবাই মিলে থাকে সজনেখোলায়।

হাতেকলমে

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব এবং সুলেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সন্তান। কবিতা, গদ্য, ভ্রমণকাহিনি—সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই *প্রথম প্রত্যয়*। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে—*আমি অনুপম, নটী নবনীতা, খগেনবাবুর পৃথিবী, গল্পগুজব, মঁসিয়ে হুলোর হলিডে, সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী, ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে, হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, নব-নীতা*, প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার* এবং শিশু সাহিত্যে *বিদ্যাসাগর পুরস্কার* পেয়েছেন।

১.১ নবনীতা দেবসেনের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা একটি ভ্রমণকাহিনির নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ পাখিরালয়ের বাসায় কী পাওয়া যেত না?

২.২ ছোট্ট বাঘ তার খিদে মেটানোর জন্য প্রথমে কী ধরতে গিয়েছিল?

২.৩ ছোট্ট বাঘের বাবা-মা বাসা বদলে কোথায় গিয়েছিল?

২.৪ সুন্দরবনের বাঘ কী নামে পরিচিত?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ ‘ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা’ — বাঘছানার এমন মনে হয়েছিল কেন?

৩.২ ছোট্ট বাঘ পাখির ছানা ধরতে পারেনি কেন?

৩.৩ বাঘের ছানা গর্তে থাবা দিয়েই কেঁদে উঠেছিল কেন?

৩.৪ বাঘছানাকে বাবা কীভাবে কাঁকড়ার হাত থেকে রক্ষা করল?

৩.৫ বাঘজননী লজ্জা পেয়েছিল কেন?

৪. **উদাহরণ দেখে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :**

ব্যাঘ্র > বাঘ	> মাছ	বৎস >

৫. **সন্ধি করো :**

পাখির + আলয় = ______ কাঁদ্ + না = ______

শব্দার্থ : পাখিরালয় — পাখিদের অভয়ারণ্য। ডেরা — আস্তানা। লালঠেঙো — লাল রং -এর পা বিশিষ্ট। দাঁড়া — দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং।

৬. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লেখো :

বন — পাড়ে — বাড়ি —
বোন — পারে — বারি —

৭. নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য ও কোনটি বিশেষণ খুঁজে বার করে আলাদা দুটি স্তম্ভে লেখো। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :

মন , শরীর , সব্বোনেশে , ভদ্র , এক , পেট , রাগ।

৮. নিম্নরেখ পদগুলির বিভক্তি অংশ আলাদা করে দেখাও :

৮.১ ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা।

৮.২ পাখির সঙ্গে পেরে উঠবে নাকি?

৮.৩ ছোট্ট বাঘের মস্ত হলুদ বাবা।

৯. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :

৯.১ তার মনে মনে জমছে কেবল রাগ।

৯.২ বাঘছানা কি ধরতে পারে পাখি?

৯.৩ লালঠেঙো সব কাঁকড়া বেড়ায় হেঁটে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১০. নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১০.১ কবিতাটিতে দেখলাম কাঁকড়ার দাঁড়া থাকে, তোমার দেখা আর যে প্রাণীর দাঁড়া আছে তার সম্পর্কে দু-একটি বাক্য লেখো।

১০.২ ছোট্ট বাঘ ও তার বাবা মা পাখিরালয়ে খাবারের অভাব থাকায় সজনেখালি চলে গিয়েছিল। সারা পৃথিবীতেই আজ মানুষ বন কেটে ফেলায়, নির্বিচারে প্রাণীদের মেরে ফেলায় শুধু বাঘ নয় সমস্ত প্রাণীদেরই খাবারের অভাব তৈরি হচ্ছে। কীভাবে এগুলো বন্ধ করে সমস্ত প্রাণীদের ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এ সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

বঙ্গ আমার ! জননী আমার !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ?
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে— 'আমার দেশ'

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
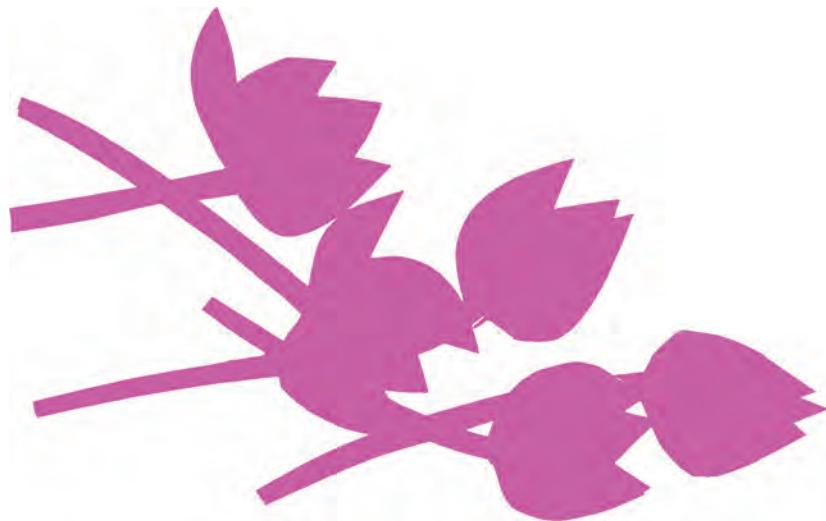
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ!

একদা যাহার বিজয়-সেনানি হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চিন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ!

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চন্ডীদাস যেথা গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি তো মেষ!
দেবী আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
ত্রিংশ কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন— 'আমার দেশ।'

হাতে কলমে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ -১৯১৩) — বাংলা সাহিত্যের নামকরা নাট্যকার হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় কবি হিসাবে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আর্য্যগাথা* (১ম ভাগ)। কবি রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— *আর্য্যগাথা* (২য় ভাগ), *মন্দ্র*, *আষাঢ়ে*, *আলেখ্য*, *ত্রিবেণী* ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি প্রতিভার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তিনি মানুষের মুখের ভাষাকে ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। তিনি অনেক হাসির কবিতা রচনা করেছেন। 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' হিসেবে পরিচিত তাঁর গানগুলি আজও বাঙালিজীবনে সমাদৃত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মূল সুর ছিল স্বদেশপ্রেম।

১.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

১.২ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মূল সুর কী ছিল?

২. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

মলিন, মধুর, আসন, দৈন্য, প্রণত

৩. **নীচে কতগুলি উপসর্গযুক্ত শব্দ দেওয়া হলো। শব্দগুলি থেকে উপসর্গ আলাদা করে দেখাও:**

উপনিবেশ, অশোক, আলোক, প্রণত।

৪. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :**

৪.১ কেন গো মা তোর মলিন বেশ?

৪.২ অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।

৪.৩ একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

৪.৪ ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি।

৪.৫ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৫. **নীচের বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দগুলি নির্দেশমতো লেখো :**

(উদাহরণ : মা + নিমিত্ত + একবচন = মায়ের জন্য)

৫.১ আমি + সম্বন্ধপদ + বহুবচন = ——————

৫.২ —————— + কর্তৃকারক + বহুবচন = আমরা

৫.৩ —————— + সম্বন্ধপদ + একবচন = তোর

৫.৪ যিনি + সম্বন্ধপদ + একবচন = ——————

শব্দার্থ : ধাত্রী — ধারণকারিণী। ত্রিংশ — ৩০ সংখ্যক। মোক্ষ — মুক্তি, নির্বাণ। ছাইল — আচ্ছাদন করা। গান্ধার — (কান্দাহারের প্রাচীন নাম), স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর 'গা', সংগীতের রাগ বিশেষ। সেনানি — সেনাপতি, সৈন্যদল। অর্ণব পোত — সমুদ্রগামী জাহাজ। ছিন্ন — ছিঁড়ে গেছে এমন। মুরজ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। গরিমা — গৌরব, মাহাত্ম্য। ভাতিবে — প্রকাশিত হবে, দীপ্তি পাবে। দৈন্য — অভাব। ক্লেশ —কষ্ট, যন্ত্রণা।

৬. **একইরকম অর্থযুক্ত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :** গৌরব , সুর , মুক্তি , নতুন , জলধি।

৭. **নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি স্থান সম্পর্কে দু-চারটি বাক্য লেখো :**
বুদ্ধ, রঘুমণি, নিমাই, চণ্ডীদাস।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৮.১ কবি দেশকে কী কী নামে সম্বোধন করেছেন?

৮.২ 'কেন গো মা তোর মলিন বেশ'—'মা' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? তাকে 'মা' বলা হয়েছে কেন?

৮.৩ 'মা'-এর বেশ মলিন ও কেশ রুক্ষ কেন?

৮.৪ অশোক কোথায় কোথায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?

৮.৫ 'অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর' — 'অর্ধ-জগৎ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কার চরণে তা প্রণত হয়েছে?

৮.৭ 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য'— প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন? তিনি কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন?

৮.৮ 'ধন্য আমরা'— 'আমরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? আমরা কখন নিজেদের ধন্য বলে মনে করতে পারি?

৮.৯ নবীন গরিমা কীভাবে ললাটে ফুটে উঠবে?

৮.১০ আমরা কীভাবে বঙ্গজননীর দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা দূর করতে পারি?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৯.১ 'যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর'— কবির কেন মনে হয়েছে যে বঙ্গ জননীকে আঁধার ঘিরে আছে?

৯.২ এই বঙ্গভূমি তোমার কাছে কেন প্রিয় সে সম্পর্কে জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৯.৩ চীন, জাপান, তিব্বতে বাঙালি সত্যি কি কোনোদিন উপনিবেশ তৈরি করেছিল? শিক্ষক / শিক্ষিকার কাছ থেকে এ বিষয়ে জেনে নিয়ে লেখো।

৯.৪ পরাধীন ভারতের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এই কবিতায় দেশের প্রতি যে ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাশ

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

যতীন দাশের জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে মামার বাড়িতে। তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই-বোন ছিলেন। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাশ জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ স্বদেশি আন্দোলনের সময় ইংরেজের গোলামি করবেন না বলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান খুলে সংসার চালাতে গিয়ে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। ১৯০১ সালের দশহরার দিনে বঙ্কিমবাবু সপরিবারে গঙ্গাস্নান করে একটা ফিটন গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে (রেড রোডে) কয়েকটি ব্রিটিশ টমি তাঁদের জোর করে ওই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়িটি চেপে চলে যায়। বঙ্কিমবাবুকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলো। ওই দিনই উনি শপথ নেন সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।

১৯২১ সালে যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে আই. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম ডিভিশন পান। তারপর ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ার বি. এ. ক্লাসে ভরতি হয়ে যান। ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এমনি ভোজনবিলাসী মানুষ ছিলেন যে পকেটে পয়সা থাকলে বন্ধুদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এমন এক ভোজনবিলাসী মানুষকেও মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরণ অনশনের পথই বেছে নিতে হয়েছিল কোন মন্ত্রবলে? তা হলো 'দেশপ্রেম' যা বিপ্লবীকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দেয় না যে, 'সবার আগে দেশের স্বাধীনতা — তারপর অন্য কথা।'

কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯-২০ সালে মাত্র ১৫-১৬ বছর বয়সে একটা বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। কিন্তু জেলে তাঁকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়ায় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শেষপর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় দেবেন বসু নামে এক দক্ষ বিপ্লবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয় । দেবেন বসুই শচীন সান্যালের সঙ্গে যতীন দাশের ঘনিষ্ঠতা করে দেন। এই সময় যতীনের ছদ্মনাম হয় — 'রবিন'। আর কিছু দিন গেলে যতীন দাশ আর একটু সিনিয়র হলে তাঁর দ্বিতীয় ছদ্মনাম হয় 'কালীবাবু'। শচীন সান্যাল সিনিয়র ও জুনিয়ার সব বিপ্লবীদের নিয়ে বোমা বানানোর ট্রেনিং ক্লাস শুরু করেন। তাতে যতীন সবচেয়ে সফল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।

১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল ভারতের সব প্রান্তের বিপ্লবীদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যার নাম দেন — Hindusthan Socialist Republican Association (প্রথমে নাম ছিল Army, পরে বদল করে নাম করা হয় Association)। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পিস্তলের সমস্যা মেটাতে খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে যতীনের সক্রিয়তায় এবং বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র, দেওঘরের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন লাহিড়ি, পাঞ্জাবের ইন্দার সিং নারায়ণ ইত্যাদি উগ্রবাদী বন্ধুদের সহায়তায় একটি পিস্তল ও বোমার গোপন দোকান গড়ে ওঠে।

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় যতীন বোমা তৈরির উন্নত প্রণালী শেখাতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ট্রেনিং দিতেন। ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ওই সময় বাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে না। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পুলিশ গিরীশ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে (যতীন্দ্রনাথকে) গ্রেফতার করে। একটা মজার ব্যাপার হলো সাক্ষীরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ শাসকরা Bengal Ordinance প্রয়োগ করে তাঁকে আটক করে রাখে। মেদিনীপুরের এক Condemned Cell-এ তাঁকে রাখা হয়। ওই সময় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন জেল-ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে ময়মনসিং জেলে পাঠানো হয়। এখানে স্বদেশি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলতে দেখে তিনি জেল-সুপারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে দেন। অবশেষে গোয়েন্দা বিভাগের D.I.G লোম্যানের হস্তক্ষেপে একুশ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ

হয়। তারপরই তাঁকে পাঞ্জাবের মরু-অঞ্চলের দুর্গম ও ভয়াবহ মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক ওই সময়েই তাঁর একমাত্র ভগিনী লাবণ্যপ্রভা দেবীরও মৃত্যু হয়।

১৯২২-২৫ এই সময়টায় জাতীয় কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় আর ঠিক এই সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। আবার ওই সময়েই যতীন দাশ শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মী ও মানুষ হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেককে সামরিক পদ্ধতিতে ড্রিল, মার্চপাস্ট, অভিবাদন ইত্যাদি করানো হতো। আর এই ব্যাপারে যতীন দাশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি সে সময়ে South Calcutta National School -এর অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ছাত্রদের ড্রিল (Drill) শেখাতেন। কথাগুলি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যতীন দাশ সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁর *Indian Struggle* বইটিতে।

১৯২৮ থেকে অর্থাৎ সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মত পার্থক্য দেখা যায়। জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী সদস্যদের অবস্থান শক্ত করতে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন দাশ সুভাষচন্দ্রের পথই শ্রেষ্ঠ পথ বিবেচনা করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকেই সমর্থন জানান।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মত পার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন। এই সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাবে হিন্দ নওজোয়ান সভা নামে একটি বিপ্লবী দল

প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফল হিসেবেই পুলিশি নির্যাতন ও লাঠিচার্জ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। ফলে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় নিহত হন। পাঞ্জাব কেশরীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান মি. স্কটের সহকারী মি. সন্ডার্সকে হত্যা করে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে মেস খুঁজে বের করে যতীন দাশের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর তাঁকে (যতীনকে) অনুরোধ করেন ভগৎ সিং-এর নওজোয়ান সভার জন্য যেন কিছু করেন। ভগৎ সিং-এর কথায় ও আগ্রহে খুশি হয়ে যতীন দাশ বলেন — 'বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমার যা করণীয় ও দেওয়ার তা আমি উজাড় করে দিয়েছি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পায়ে। তবে তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্যও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে। তা হলো আগ্রায় গিয়ে তোমার দলের ছেলেদেরও বোমা বানানোতে অত্যন্ত দক্ষ করে দিয়ে আসতে হবে।' কথাবার্তায় দুজনেই বেশ খুশি হন এবং সে রাত্রে ভগৎ সিং যতীন দাশের দক্ষিণ কলকাতার মেসে রাত্রিবাস করেন। এর কিছু দিন পরে যতীন দাশ আগ্রায় গিয়ে ভগৎ সিং-এর দলের ছেলেদের বোমা বানানোর কাজে ভালোরকম ট্রেনিং দিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদের আসনের পাশেই হঠাৎ একটি শক্তিশালী বোমা ফাটান ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে তাঁরা দুজনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই ঘটনার পিছনে ভারতব্যাপী এক বিশাল পরিকল্পনা আছে সন্দেহ করে তদানীন্তন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মি. প্যাট্রি (Mr. Pattry) নিজে পুনরায় তদন্ত শুরু করেন। এর ফলে ত্রিশটি নামের একটি তালিকা বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন দাশ। কালবিলম্ব না করে Lahore Conspiracy Case-এর অন্যতম অভিযুক্ত আসামি হিসেবে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যতীন দাশকে গ্রেফতার করা হয় ১৪ জুন, ১৯২৯ তারিখে।

২৫ জুন তারিখে যতীন ও তাঁর ১৫ জন সহযোদ্ধাকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। ওই সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন — অজয়কুমার ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, কৃষ্ণকুমার, রাজগুরু প্রমুখেরা। বটুকেশ্বর দত্তকে আগেই লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ভগৎ সিংকেও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয় পয়লা জুলাই ১৯২৯ সালে।

ঠিক পরের দিনই দোসরা জুলাই যতীন গোপনে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, এখানে তাঁদের ওপর যে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে তাঁরা ১৬ জন সমবেতভাবে অনশন (Group Hunger Strike) শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শোনামাত্র বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং ওই সমবেত অনশনে শামিল হওয়ার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

১৩ জুলাই, ১৯২৯ (রবিবার) থেকে সমবেত অনশন (Group Hunger Strike) যথারীতি শুরু হয়। ওই অনশন আরম্ভ করার ঠিক দু-এক দিন আগে যতীন তাঁর সহযোদ্ধাদের অঙ্গীকার করিয়ে নেন যে, তাঁদের দাবিগুলোর যথাযথ মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁরা অবশ্যই অনশন ভঙ্গ করবেন। তবে যতীন্দ্রনাথ করবেন না। কেন-না, তাঁর পক্ষে এই অনশনই হবে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে। তা হলো পলাশির প্রান্তরে বাঙালি মিরজাফরকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করা। সহযোদ্ধাদের তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে এব্যাপারে তাঁর পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশের অনুমতি আগেই তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

১৩/৭/১৯২৯ থেকে ১৯/৭/১৯২৯ — সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আট দিনের দিন (২০ জুলাই তারিখে) ভোরবেলা জেল-সুপার জেল-ডাক্তার ও আটজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে যতীনের সেলে প্রবেশ করলেন। তারপর কোনোরকম সংকেত না দিয়েই ওই আটজন পাঠান একই সঙ্গে আট দিন অভুক্ত ও বিশেষ দুর্বল যতীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই সুযোগে ডাক্তার একটা সরু নল যতীনের নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দুধ ঢালতে শুরু করে দেন। আর কোনো উপায় না দেখে যতীন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে জোরে জোরে কাশতে থাকেন। ফলে ওই নলটির মুখ খাদ্যনালী থেকে সরে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুটা দুধও যতীনের ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

৪৮ ঘণ্টা পরে (২২ জুলাই, ১৯২৯) যতীনের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলতেই তিনি লক্ষ করেন যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য সেল-ভরতি ঘরে নানা ধরনের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরও বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাছাড়াও লক্ষ করলেন যে তাঁর পাশে রাখা হয়েছে সদ্য কেনা একটা শ্লেট ও একটা পেনসিল। বুঝতে বাকি রইল না যে জীবনে আর কথা কইতে পারবেন না বলেই এখন থেকে সব কিছু ওই শ্লেটে লিখে জানাতে হবে। ওই দিনই সন্ধেবেলা (২২/৭/১৯২৯) ছোটোভাই কিরণ দাশও এসে হাজির। বলাবাহুল্য, যতীনের ওই সঙ্গিন অবস্থা উপলব্ধি করে স্বয়ং বড়োলাট লর্ড আরউইন তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে যতীনকে দেখাশোনা করার জন্যই কিরণ দাশকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং ৬৩ দিনের ওই ঐতিহাসিক অনশনের ৫৩ দিনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে রইলেন স্বয়ং ছোটো ভাই কিরণ দাশ।

১১ আগস্ট (১৯২৯) বড়োলাট লর্ড আরউইন এক বিশেষ জরুরি ঘোষণায় অনশনকারীদের দাবিদাওয়া সব মেনে নিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে জেল অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ১২ আগস্ট (৩১ দিনের দিন) যতীনের ১৭ জন সহযোদ্ধা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তে রাঙা অধ্যায়।

আগস্টও যায় যায়। শরীর সব দিক থেকেই ভেঙে পড়েছে — পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন যতীন একটু একটু করে।

৫০ দিনের দিন (৩১ আগস্ট) দেখা গেল যে, পক্ষাঘাত তাঁর সমস্ত শরীর গ্রাস করে ফেলেছে। যখন ওই পক্ষাঘাত যতীনের হৃদযন্ত্রকে স্পর্শ করবে তখুনি তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এত দিনে টনক নড়ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু তবুও শাসকরা যতীন্দ্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে রাজি নয়। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ ও ছোটোভাই কিরণচন্দ্র ঘৃণাভরে জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর এক সর্বজননিন্দিত গুপ্তচরের জামিনে যতীনকে মুক্ত করা হয় পঞ্চান্ন দিনের দিন (৫/৯/২৯)। পরের দিন (৬/৯/২৯) একেবারে কাকভোরে

ডাক্তার ও জেল-সুপার অ্যাম্বুলেন্স ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে জেলে প্রবেশ করে দেখেন যে যতীনের সহযোদ্ধারা তার সেলের চারপাশে ব্যারিকেড রচনা করে পথ অবরোধ করে শুয়ে আছে। তখন ডাক্তার জেল-সুপারকে বোঝান যে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কেন-না জোর করে যতীনকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার চেষ্টা করলেই উত্তেজনায় যতীনের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

পরের সাতদিন (৭/৯/২৯ থেকে ১৩/৯/২৯) হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দারুণ উদবেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা — শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে ঠিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে অমর বিপ্লবী যতীন দাশ চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

লাহোর থেকে যতীনের মরদেহ হাওড়া পৌঁছোতে তিন দিন লেগেছিল। কারণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই শ্রদ্ধাবনত দেশবাসী ট্রেন থামিয়ে ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। শবাধার গ্রহণ করতে হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন — সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও শ্রীমতী কমলা নেহরু প্রমুখেরা। সরকারি হিসেবেই পাঁচ লক্ষ মানুষ হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন। খবরটা শোনামাত্র ক্ষোভে ও দুঃখে মর্মাহত কবি রাত্রি জেগেই লিখে ফেলেছিলেন —

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ —
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহো।

হাতে কলমে

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১১) : জন্ম নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। পড়াশোনা সেন্ট পলস কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও আকাশবাণীতে ফুটবলের ইংরাজি ধারাভাষ্যকার ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *স্বাধীনতার রূপকার নেতাজি সুভাষ, ইতিহাসের পাতা থেকে*।

১.১ আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় কোন খেলার ধারাভাষ্যকার ছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ যতীন দাশ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

২.২ যতীন দাশের পিতার নাম কী ছিল?

২.৩ যতীন দাশের পিতা কোথায় চাকরি করতেন?

২.৪ যতীন দাশের ছদ্মনাম কী ছিল?

২.৫ হিন্দ নওজোয়ান সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?

২.৬ মি. প্যাট্রি কে ছিলেন?

২.৭ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের কোন জেলে বদলি করা হয়?

২.৮ কারা যতীনের জামিনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেন?

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

অংশ, উত্তীর্ণ, ঐতিহাসিক, আক্রান্ত, জীবন, ভোজন, পিতা, সন্দেহ, জাতীয়, মেয়াদ।

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** পর্যন্ত, কিন্তু, প্রত্যক্ষ, সিদ্ধান্ত, যতীন্দ্র, ব্যগ্র।

৫. **নীচে কতগুলি শব্দ দেওয়া হলো। শব্দগুলির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত করে নতুন শব্দ তৈরি করো :**

জীবন, শেষ, বেশ, পথ, ঠিক, দারুণ, উপায়, জ্ঞান, করণীয়।

৬. **নীচে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাল তারিখ দিয়ে দেওয়া হলো। ঘটনাগুলি গল্প থেকে খুঁজে লেখো :**

২৭ অক্টোবর ১৯০৪; ৮ এপ্রিল ১৯২৯; ২৫ জুন ১৯২৯; ১১ অগস্ট ১৯২৯; ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

শব্দার্থ : আমরণ অনশন — মৃত্যু পর্যন্ত উপবাস। পিকেটিং — দাবি আদায়ের জন্য দলবদ্ধভাবে অবস্থান। মেয়াদ — ধার্য সময় বা কাল। দুর্গম — যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায়। অবৈতনিক — বেতন নেয় না এমন। আনুগত্য — বশ্যতা। প্রত্যাহার — ফিরিয়ে নেওয়া। ব্যবস্থাপক — নিয়ম বিধান বা আইন গঠনকারী। যাবজ্জীবন — চিরজীবন, আমরণ। অঙ্গীকার — প্রতিজ্ঞা। নিরুপদ্রব — উৎপাতহীন, নিরাপদ। প্রলুব্ধ — অত্যন্ত লোভযুক্ত, আকৃষ্ট।

৭. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ বেছে লেখো :

৭.১ তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই বোন ছিলেন।

৭.২ যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউটিশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

৭.৩ বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেলা হয়।

৭.৪ তাঁর দ্বিতীয় ছদ্মনাম হয় 'কালীবাবু'।

৮. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :

৮.১ কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

৮.২ ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে।

৮.৩ শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তে রাঙা অধ্যায়।

৮.৪ শেষ পর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৯. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যে সব বিভক্তিযুক্ত শব্দ এবং অনুসর্গ আছে তা খুঁজে লেখো :

৯.১ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন।

৯.২ ছেলেবেলা থেকে তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে।

৯.৩ সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

৯.৪ শরীর সবদিক থেকেই ভেঙে পড়ছে।

১০. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

১০.১ যতীন দাশের পিতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন কেন? এর ফল কী হয়েছিল?

১০.২ ‘... তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্য ও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে’— কে কাকে একথা বলেছিলেন?

১০.৩ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কী ঘটেছিল?

১০.৪ ১৪ জুন ১৯২৯ যতীন দাশকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়?

১০.৫ ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই অনশন শুরু হয় কেন?

১০.৬ অনশন করার আগে যতীন তাঁর সহযোদ্ধাদের কী অঙ্গীকার করান? তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন না কেন?

১০.৭ জেলে অনশনের সময় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেন?

১০.৮ জেলে যতীন দাশের পাশে শ্লেট পেন্সিল রাখা হয়েছিল কেন?

১০.৯ কিরণ দাশকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়েছিল কেন?

১০.১০ যতীন দাশের সহযোদ্ধারা পথ অবরোধ করে শুয়েছিলেন কেন?

১১. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১১.১ যতীন দাশের মতো ভারতের অন্য কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনকথা জানা থাকলে খাতায় লেখো।

১১.২ যতীন দাশের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাংলার এক বিশিষ্ট কবি তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবির পরিচয় লিখে তাঁর অন্য কোনো কবিতা তোমার ভালো লাগে কিনা এবং কেন ভালো লাগে সে সম্পর্কে লেখো।

গান

চল রে চল সবে ভারত সন্তান

চল রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে সাধ রে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নব উৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন না করি দৃকপাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) : বিখ্যাত নাট্যকার, সংগীতকার, সম্পাদক এবং চিত্রশিল্পী। কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশে এই মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সংগীতসংক্রান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ‘স্বরলিপি গীতিমালা’ বিখ্যাত। সংগীতবিষয়ক পত্রিকা ‘বীণাবাদিনী’ এবং ‘সঙ্গীত প্রকাশিকা’-র সম্পাদক ছিলেন।

মোরা দুই সহোদর ভাই

কাজী নজরুল ইসলাম

হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই
দুই সহোদর ভাই ।।

সৃষ্টি যাঁর মুসলিম রে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তাঁরই
মোরা বিবাদ করে খোদার উপর করি যে খোদকারি।
শাস্তি এত আজ আমাদের হীন-দশা এই তাই
দুই সহোদর ভাই ।।

দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।
দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে—
সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে
চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই
বাইরে শুধু রঙের তফাত ভিতরে ভেদ নাই
দুই সহোদর ভাই ।।

হাতেকলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর কবিতা কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, তাঁর বিদ্রোহী চেতনা সমাজের সমস্ত রকম অসাম্য, অন্যায় এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তাঁর কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হলো হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঐতিহ্যের সার্থক মেলবন্ধন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে — *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশি*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণীমনসা*, *প্রলয়শিখা* প্রভৃতি।

পাঠ্য কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত ‘নজরুল রচনা সমগ্র (সপ্তম খণ্ড)’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

শব্দার্থ: সহোদর – একই মায়ের সন্তান। বৃন্ত – বোঁটা। কুসুম – ফুল। ঠাঁই—স্থান, আশ্রয়। বিবাদ – ঝগড়া। হীন-দশা – দুরবস্থা। খোদকারি – অসঙ্গত, অনুচিত হস্তক্ষেপ। মড়ক – মৃত্যুমিছিল।

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ ‘মোরা দুই সহোদর ভাই’ কবিতায় ‘সহোদর’ কারা?

২.২ ‘আমাদের হীন-দশা এই তাই’ — আমাদের এই ‘হীন-দশা’র কারণ কী?

২.৩ ‘বাইরে শুধু রঙের তফাত ভিতরে ভেদ নাই’ — ‘রঙের তফাত’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৩.১ ‘এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই।’ — পঙ্‌ক্তিটিতে প্রদত্ত উপমাটি ব্যাখ্যা করো।

৩.২ ‘সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে’— কার, কোন দানের কথা এখানে বলা হয়েছে?

৩.৩ ‘চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই’

— ‘চাঁদ সুরুযের আলো’ কী ? কবির এই প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করে লেখো :**

৪.১ মোরা বিবাদ করে খোদার উপর করি যে খোদকারি।

৪.২ দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে।

৪.৩ সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে।

৫. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

সহোদর, সৃষ্টি, বৃষ্টি, শান্তি।

৬. **‘বি’ উপসর্গ যোগে পাঁচটি শব্দ তৈরি করো।**

৭. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে লেখো :**

কুসুম, ভারত, সৃষ্টি, বিবাদ, জাতি, রং।

৮. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :**

৮.১ হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।

৮.২ দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে।

৮.৩ বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।

৮.৪ চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম বেশি কি পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো কথা, ছোটো গীত, আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা-কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবই বলে, 'যাই যাই' নিমেষে নিমেষে,
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে—
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings* (গীতাঞ্জলি)-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *চৈতালি* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

১.১ কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গীতিনাট্যের নাম লেখো।

১.২ তোমাদের পাঠ্যকবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ কবির মনে আজ কী ভাবনা এসেছে?

২.২ যেতে যেতে নদীতীরে কবির চোখে কোন দৃশ্য ধরা পড়েছে?

২.৩ সবাই প্রতি মুহূর্তে কী কথা বলছে?

২.৪ যা কিছু দেখেন তাকেই কবি ভালোবাসেন কেন?

২.৫ কবি কাদের ভাইবোনের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

২.৬ গ্রামগুলি দেখে কবির কী মনে হয়েছে ?

২.৭ পৃথিবীর দিকে তাকালে কবির কী মনে হয়?

শব্দার্থ : ধরা — পৃথিবী। হেরি— দেখি। ধরণী— পৃথিবী। তরণী— নৌকো। শ্যামল— সবুজ। নিমেষ—মুহূর্ত। নয়ন/নয়ান— চোখ। উৎসুক— ব্যগ্র। পরান— প্রাণ, জীবন। বাহিয়া— বেয়ে।

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

শ্যামল, দুঃখ, সুখ, করুণ, ছায়াময়, গ্রাম, উৎসুক, আলো।

৪. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :**

বাহিয়া	>	
	>	দেখি
মোর	>	
	>	পরান

বেয়ে, প্রাণ, আমার, হেরি

৫. দুটি বিপরীতার্থক শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হওয়া শব্দগুলি কবিতা থেকে খুঁজে বের করো। ওই শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য লেখো।

৬. **নীচের বাক্যগুলির রেখাঙ্কিত অংশে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে লেখো :**

৬.১ চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।

৬.২ কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী ।

৬.৩ 'ক্ষণকাল দেখি বলে দেখি ভালোবেসে'।

৬.৪ সবি বলে, 'যাই যাই ' নিমেষে নিমেষে।

৬.৫ যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে।

৭. **নীচের কবিতাংশটি ভেঙে পৃথক পৃথক বাক্যে লেখো :**

যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়নে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৮.১ 'আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী'— এখানে 'যেন' শব্দটি কেন ব্যবহার হয়েছে লেখো।

৮.২ কবির কল্পনার নৌকাযাত্রায় কী কী দৃশ্য তিনি দেখছেন?

৮.৩ সুখদুঃখকে কবির ভাইবোন মনে হয়েছে কেন?

৮.৪ 'মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো'— কখন পৃথিবীকে ভালো মনে হয়? এরকম মনে হবার কারণ কী?

৮.৫ ট্রেন, নৌকো বা দূরপাল্লার বাসে করে যেতে যেতে পথের দুধারে যা দেখেছ তার বর্ণনা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

মিলিয়ে পড়ো ‘ধরাতল’ কবিতায় নদীর কথা আছে। এখানে নদীর আরেক রূপ তোমাদের সামনে ফুটে উঠবে।

সেথায় যেতে যে চায়

বন্দে আলী মিয়া

রাখাল ছেলে গোরু চরায় মধুমতীর চরে
তাহার পানে চেয়ে আমার মন যে কেমন করে।
ওই চরেতে সারাটি দিন পাখির কোলাহল
চারদিকে তার গান গেয়ে যায় পদ্মানদীর জল।
শ্যামল কচি দূর্বা ঢাকা চরের আঙনখানি
বিহান বেলায় জাগে সেথায় আলোর ঝলকানি।
কাশ ফুলেরা দোলায় চামর নদীর কিনারায়
সারাটি দিন ফড়িং শালিক উড়ে উড়ে যায়।
সাধ হয় যে বাঁধি হোথায় ঘর
মাটি মায়ের সঙ্গে থাকি সারা জীবন ভর।
গাঙের কূলে বসে একা শামুক কুড়াইয়া
মালা গেঁথে নেব আমার বুকে দোলাইয়া।
পাখির পালক কানে গুঁজে চলে গুঁজে লবো
দুপুরবেলা ওপার থেকে এপার চেয়ে রবো।
নদীর জলে পাল তুলিয়া কতই যাবে না’
কোথায় যাবে বাঁক ছাড়ায়ে নাইকো ঠিকানা।
ডিঙি বেয়ে ওপার থেকে আসবে সকল জেলে
ধরবে ইলিশ রুই কাতলা খ্যাপলা জাল ফেলে।
ডিঙির ’পরে মাছেরা সব লাফিয়ে হবে সারা
একজনা সে বাগিয়ে লাঠি দেবে গো পাহারা।
কূলে বসি যখন চিল চাইবে সে-দিক পানে।
ডিঙির ’পরে মাছেরা সব লাফিয়ে হবে সারা
একজনা সে বাগিয়ে লাঠি দেবে গো পাহারা।
কূলে বসি যখন চিল চাইবে সে-দিক পানে।
গাঙচিলেরা উড়বে খালি চুরির সন্ধানে।
মধুমতীর চরে
নিশীথ রাতে জোস্না ধারা চাঁদ হতে যায় ঝরে।
সাঁঝ বিহানে নরম রোদে জাগে রঙের খেলা
হোথায় গিয়ে আজকে আমি কাটিয়ে দেবো বেলা।

হাবুর বিপদ

অজেয় রায়

স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাবু ভাবল, থাক ফিরে যাই।

গরমকাল। মর্নিং স্কুল হচ্ছে। আর কয়েক মিনিট পরে সাতটা বাজবে। ঘন্টা পড়বে স্কুল আরম্ভের। একতলা স্কুল বাড়িটার ঘরে ঘরে ছেলেদের কলরব। উঠানে কিছু ছেলে খেলছে। হাবুর মনে ভেসে ওঠে সুধীরবাবুর ভারিক্কি চেহারা। গম্ভীর মুখ, মোটা চশমার কাচের আড়ালে বড়ো বড়ো দুটি চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি। হাবু জানে স্যার তাকে পছন্দ করেন! কিন্তু তা বলে ক্লাসের কাজে অবহেলা ক্ষমা করার লোক নন তিনি।

যদি স্কুলে না যায়? সময় কাটাবার জায়গার অবশ্য অভাব নেই। দত্তদের আমবাগানে ঢুকলেই খাসা সময় কেটে যাবে। কিন্তু ক্লাস কামাই করলে কাল বাবার কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে, অনুপস্থিত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে। তখন? বাবাকে কী কৈফিয়ত দেবে? বই হাতে স্কুলে বেরিয়ে, গিয়েছিলে কোন চুলোয়? অতঃপর অবধারিত মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে হাবু শিউরে ওঠে। ভীষণ রাগ হতে থাকে ভজার ওপর। ওর পাল্লায় পড়েই এই গন্ডগোল। হাবু তো প্রথমে রাজি হয়নি। ভজাটা কিছুতেই ছাড়ল না। এখন?

বাবা না সুধীরবাবু? না, না, বাবা কিছুতেই নয়। যদি বরাতে দুর্ভোগ থাকে স্যারের হাতেই হোক। হাবু স্কুলে ঢুকে পড়ে।

উঁহু, আজ লাস্ট বেঞ্চ নয়। ওটার ওপর স্যারেদের চিরকাল কড়া নজর। মাঝামাঝি বসা যাক। ভাগ্যে থাকলে পাঁচজনের ভিড়ে মিশে হয়তো এ যাত্রা পার পেয়ে যেতে পারে। থার্ড বেঞ্চের এক কোণে তিনকড়ির পাশে হাবু বসে পড়ল।

পর পর তিনটে ক্লাস কেটে গেল। এবার আসবেন সুধীরবাবু। বাংলা রচনার ক্লাস। তারপর টিফিন। হাবু বাইরে যতটা সম্ভব শান্ত থাকবার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে কিন্তু তার হাপর পড়ছে।

সুধীরবাবুর ধীর পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকলেন। দশাসই মানুষটির পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কাঁধে পাট করা সাদা চাদর। ছাত্ররা তাঁকে ভয় ভক্তি দুটোই করে। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর খাটেন। তবে বড্ড কড়া মাস্টার।

চেয়ারে বসে সুধীরবাবু প্রশ্ন করলেন, গতবারে কী রচনা লিখতে দিয়েছিলাম?

—বাংলাদেশে বর্ষাকাল।

—ও হ্যাঁ। সবাই লিখে এনেছে?

হ্যাঁ স্যার! ক্লাস সুদ্ধু ছেলের ঘাড় হেলে।

—বেশ কয়েকটা শোনা যাক।

ছেলেরা যে যার রচনাখাতা বের করে ওপরে রাখে।

এইটাই সুধীরবাবুর মেথড। কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন। অন্যদের বলেন মন দিয়ে শুনবে। অন্যদের লেখা শুনলে নিজের লেখার মান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। আমি তো সবার খাতা বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুধরে দেব। কিন্তু প্রত্যেকের লেখা তো প্রত্যেকে পড়তে পারবে না। অন্তত ক্লাসে কয়েকখানা রচনা শোনো। কে কেমন লিখেছে কিছুটা জানো।

—প্রফুল্ল পড়। সুধীরবাবু আদেশ দিলেন।

প্রফুল্ল খাতা খুলে 'বাংলাদেশে বর্ষাকাল' পড়তে আরম্ভ করে।

পাতা দুই শোনার পর হঠাৎ সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন—থাম। আমি রচনা লিখতে বলেছি। বই থেকে কপি করতে বলিনি।

কেন স্যার—প্রফুল্ল আমতা আমতা করে।

—আবার কেন? দে সরকারের রচনার বই থেকে হুবহু টুকে এনেছ। এ চলবে না। কাল নতুন করে লিখে এনে দেবে। আর কষ্ট করে আরও দু-একখানা বই উলটিও। মনে থাকবে?

—নিতাই? —এবার তাঁর লক্ষ লাস্ট বেঞ্চ।

নিতাই নামকরা ফাঁকিবাজ। প্রথমটা ভান করল যেন শুনতেই পায়নি।

—নিতাই! —আমাকে বলছেন স্যার?

—হ্যাঁ, ক্লাসে আর কটা নিতাই আছে? পড়।

নিতাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হলো?

—আজ্ঞে লিখতে পারিনি।

—কেন?

আজ্ঞে সময় পাইনি, মায়ের অসুখ।

—ও তোমায় বুঝি মায়ের সেবা করতে হয়েছে। দুই দিদি কী করছিল? —আজ্ঞে বারবার ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, করতে হয়েছে কিনা। বাবার মোটে সময় নেই। তাই।

—কি হয়েছে তোমার মায়ের?

—জ্বর, সর্দি, কাশি।

—এখন কেমন আছেন?

—জ্বর ছেড়েছে। আজ ভাত খেয়েছেন।

—মিথ্যাবাদী! সুধীরবাবুর গর্জনে সারা ক্লাস কেঁপে ওঠে। গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাই বাড়িতে কীর্তন শুনছেন। দাঁড়িয়ে থাক ওই কোণে। টিফিনেও বেরোবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কালকেই তোমার রচনা চাই। এই নিয়ে পরপর দু-দিন হলো। ফের যদি রচনা আনতে ভুল হয়, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। মনে থাকবে?

'মনে থাকবে,' সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ। মনে থাকুক না থাকুক, তিনি সবাইকে বলে যান—মনে থাকবে?

—প্রশান্ত।

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত খাতা বাগিয়ে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বেশ দীর্ঘ রচনা। সুন্দর গুছিয়ে লেখা। বর্ষার বর্ণনায় কয়েকটা তালমাফিক কবিতার উদ্ধৃতিও হয়েছে। সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

তবে ছেলেরা লক্ষ করে স্যারের কপালের মাঝখানে একটি ভাঁজ। অর্থাৎ তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ওই ভাঁজ তার চিহ্ন।

প্রশান্তের পাঠ শেষ হলে সুধীরবাবু বললেন, ভালো হয়েছে, তবে আরেকটু মৌলিক হওয়া উচিত। শুধু রচনা বইগুলোর ওপর নির্ভর করবে কেন? চাই নিজস্ব ভাব, ভাষা। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবেই রচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে। মনে থাকবে?

প্রশান্ত একটু ক্ষুণ্ণ মনে বসে পড়ে।

সুধীরবাবুর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে।—হাবুলচন্দ্র!

হাবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—হাবুল।

হাবু এবার উঠে দাঁড়ায়! উঃ কি ভাগ্য তার!

—পড়ো তোমার রচনা।

হাবু একটু ইতস্তত করে কয়েকবার ঢোঁক গেলে! —আঃ দেরি করছ কেন?

হাবু হাইবেঞ্চে রাখা বইখাতাগুলোর ওপর থেকে একটা খাতা তুলে নিল। খাতা খুলে নাকের সামনে মেলে ধরে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

—কই আরম্ভ করো। বড্ড সময় নিচ্ছ। সুধীরবাবু তাড়া দেন।

—হ্যাঁ স্যার। হাবু পড়তে শুরু করে—

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসকে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বলে। এই দুই মাসে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে তাই এই ঋতুর নাম বর্ষা। বর্ষার আগে গ্রীষ্মকাল। প্রচন্ড গরম পড়ে তখন। মাঠঘাট শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ডোবা পুকুরে জল যায় মরে। সূর্যের তাপে মানুষজন পশুপাখি গাছপালা সবাই হাঁসফাঁস করতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয় বটে, তবে বৃষ্টি দু-এক পশলা। ঝড়ের দাপটটাই হয় বেশি। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি

আকাশে কালো কালো মেঘ জমতে শুরু করে। আষাঢ় মাসে নামে অঝোর বৃষ্টিধারা। বর্ষা এসে সব কিছু ভিজিয়ে দেয়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

হাবু প্রথম দিকটাই ঠেকে ঠেকে আস্তে আস্তে পড়ছিল। ক্রমে তার পড়ার গতি বাড়ে, বেশ ঝরঝর করে বলে চলে।

বর্ষা নামে বাংলাদেশের সব জায়গায়। শহরে গ্রামে জঙ্গলে পাহাড়ে। শহরে বর্ষা কোনোদিন দেখিনি, তবে গ্রামে থাকি কিনা তাই প্রতি বছরই বর্ষাকালে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় বেশ জানি। দেখতে দেখতে মজে যাওয়া পুকুর ডোবা খাল বিল জলে ভরে ওঠে। রাস্তাঘাট হয় কাদা প্যাচপ্যাচে। চলতে ফিরতে তখন ভারি অসুবিধা। কাগজে পড়েছি শহরের রাস্তাটাস্তা ভালো। কাদা হয় না। কিন্তু সেখানেও রাস্তায় জল জমে। কাগজে ছবি দেখেছি কলকাতার কোথাও কোথাও এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। লোকে নৌকো চালাচ্ছে।

অ্যাই তিনকড়ি মুখ নামাও। সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন।

তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার পানে চেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নামায়। হাবুও চমকে পড়া বন্ধ করে।

হুঁ। তারপর। সুধীরবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেন। হাবু আরম্ভ করতে একটু দেরি করে খাতার ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হলো? নিশ্চয় নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারছে না। নাঃ, বকে বকেও হাতের লেখার উন্নতি করা গেল না ছেলেটার। সুধীরবাবু ভাবেন।

হাবু আবার পড়ে—

তবে বর্ষাকালে চাষিদের ভারি ফুর্তি। বৃষ্টি ভালো হলে চাষ ভালো হবে। অনেক ফসল উঠবে ঘরে।

যে বছরে বৃষ্টি কম হয় সেবার তাদের মাথায় হাত। বাগদিপাড়ার রামু অনাবৃষ্টির বছরে আমাদের গোলা থেকে ধান নিয়ে যায়। নইলে যে তার ছেলে বউ না খেতে পেয়ে মরবে। বেশি বৃষ্টির আবার বিপদ আছে। নদীতে বন্যা হয়। আগের বছর আমাদের গাঁয়ের পাশে খরস্রোতা নদীতে বান ডাকল। দু-পাশের মাঠ ভেসে গেল। কত শস্যক্ষেত ডুবে নষ্ট হলো। গাঁয়ের মধ্যেও জল ঢুকে এসেছিল। ছোটো ছোটো অনেক মাটির ঘর পড়ে গেল। মাঝ রাত্তিরে বান এসেছিল। ভাগ্যিস দুলে মাঝি হাঁক দিয়ে ডেকে সব্বাইকে সাবধান করে দিল, নইলে অনেকে ভেসে যেত। আমাদের বাড়িতে অনেক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে রাতে।...

সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন। খাসা লিখেছে। বই-টইয়ের ধার ধারেনি। সব নিজের অভিজ্ঞতা। ভাষ্যটিও সুন্দর। ছেলেটা চর্চা রাখলে বড়ো হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।

ফার্স্টবয় প্রশান্ত পাশের ছেলেকে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল।—শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল। পয়েন্ট কই? সে ফিশফিশিয়ে বলে।

—তিনকড়ে।

তিনকড়ে আবার ঊর্ধ্বগ্রীবা বিস্ফারিত নয়নে হাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল। স্যারের ধমক শুনে মাথা নামায়।

হাবু পড়ে যায়। বর্ষাকালে তার গ্রামের জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনি।

বর্ষায় নাকি অসুখ বিসুখ খুব বাড়ে। বিশেষত পেটের অসুখ আর সর্দিজ্বর। তার ডাক্তার বাবা নাকি নাওয়া খাওয়ার সময় পান না তখন। গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা বেরোয়। কখনও কখনও সারারাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়। আর ব্যাংগুলো পাল্লা দিয়ে হেঁড়ে গলায় গান জোড়ে। হাবু শুয়ে কান পেতে শোনে, ভারি মজা লাগে। জলে গর্ত বুজে যাওয়ায় মাঝে মাঝে ঘরের দাওয়ায় সাপ উঠে আসে। প্রত্যেক বছরই গ্রামের দু-একজনকে সাপে কামড়ায়।

ভোরবেলা চাষিরা লাঙল কাঁধে হেট হেট করে গোরু তাড়িয়ে খেতে যায়। দুপুরেও মাঠে থাকে। তাদের ঘরের লোক ভাত নিয়ে যায় দুপুরে খাবার জন্যে।

আরও অনেক কিছু লিখেছে সে। মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে।

বর্ষাকালে গ্রামে তাদের কী সব পালা পার্বণ ব্রত হয়। ওই সময় স্কুলে নাকি ছাত্র কম আসে। তাদের খেতে কাজ করতে হয় তাই ছুটি নেয়। হাবুর কাজ করার দরকার নেই। তাই রোজ স্কুলে আসতে বাধ্য হয়। এমনি কত কী—

হাবুর রচনা শেষ হল। সুধীরবাবু স্মিতমুখে বললেন—বেশ হয়েছে। নিজের দেখা জিনিস লিখেছে। খুব ভালো। তবে আর একটু গুছিয়ে লেখা দরকার।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ক্লাস শেষ হতে আর পনেরো মিনিট বাকি। এবার সামনের সপ্তাহের রচনার বিষয়টা দিয়ে দেবেন আর এ সপ্তাহের খাতাগুলো নিয়ে নেবেন সংশোধনের জন্য।—হরিপদ খাতা নাও।

মনিটর হরিপদ প্রত্যেকের কাছে গিয়ে রচনা খাতা সংগ্রহ করতে লেগে যায়। সুধীরবাবু ভাবেন আসছে বারে কী রচনা দেওয়া যায় ঠিক আছে—দুর্গা পূজা। দুর্গাপূজার পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

স্যার, হাবু খাতা দিচ্ছে না।

হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন।—কেন?

তা জানি না। বলছে কালকে দেব।

—হাবুল?

হাবু উঠে দাঁড়ায়।

খাতা দিচ্ছ না কেন?

হাবুর মুখে কথা নেই।

—কী, উত্তর দাও।—আজ্ঞে কাল ভালো করে লিখে—

—দেখি খাতাটা —সুধীরবাবু রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

হরিপদ হাবুর রচনা খাতার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই তিনকড়ি টপ করে ওপরের খাতাখানা তার হাতে তুলে দেয়। হরিপদ সেখানা স্যারের হাতে সমর্পণ করে।

খাতার মলাটে চোখ বুলিয়েই তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয় গোটা গোটা করে লেখা—বীজগণিত খাতা।

ও, এই জন্যে এত ধানাই পানাই! কাল ভালো করে লিখে এনে দেবে। নাঃ, ছেলেটা অতি অগোছালো! তিনি পই পই করে সব্বাইকে বলে দিয়েছেন—একটা আলাদা রচনা খাতা করবে। যা তা খাতায় লিখবে না। দু-সপ্তাহে একটা বাংলা রচনার ক্লাস। তিনি সমস্ত খাতা বাড়ি নিয়ে যান। ভালো করে সংশোধন করে তিন-চার দিন পরে খাতা ফেরত দেন। এবার অবশ্য ফেরত দিতে আরও তিন দিন বেশি দেরি হয়েছিল। শ্রীমান ইতিমধ্যে হোমটাস্ক লিখে বসে আছে। তাড়াতাড়ি লিখেছে খুব ভালো কথা। কিন্তু তা বলে অঙ্ক খাতায় লিখবে? কোনো আলগা কাগজে বা রাফখাতায় লিখতে পারত। তারপর আসল খাতা ফেরত পেলে তাতে টুকে নিত আর হতে পারে হাবুল ওর রচনা খাতাটি হারিয়ে বসে আছে। ফলে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখেছে। ছি ছি একি নোংরামি? আজ তিনি আচ্ছা করে ধুচুনি দেবেন হাবুলকে। ছেলেখেলা পেয়েছে? সুধীরবাবু খাতার পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে হাবুকে বকুনি দেওয়ার জন্যে মনে মনে কড়া কড়া বাক্য ভাঁজতে থাকেন।

এ্যাঁ! এ কী? খাতা শেষ। কিন্তু রচনা কই?

—হরিপদ তুমি ভুল খাতা দিয়েছ, এতে রচনা নেই।

—অ্যাই ঠিক খাতা দে। যেটায় লিখেছিস। হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগায়।

তিনকড়ি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না স্যার। ওই খাতা দেখেই পড়েছে।

হ্যাঁ তাইতো। নীল মলাটে রবিঠাকুরের ছবি ছাপা। তিনি পড়বার সময় লক্ষ করেছিলেন! সুধীরবাবু আর একবার পাতাগুলো সব উলটে দেখেন। নেই!

ব্যাপার কি? ম্যাজিক নাকি? তিনি কী রকম ঘাবড়ে যান। তিনি শুনলেন। ক্লাসের ছেলেরা শুনল—অতবড়ো লেখাটা পড়ল।

—হাবু এই খাতা দেখেই পড়েছ?

হ্যাঁ—হাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

তবে লেখা কই?

হাবু নীরব নিস্পন্দ।—কি? উত্তর দাও।—হাবু চুপ।

তবে কি—সম্ভাবনাটা বিদুত্যের মতো তাঁর মস্তিকে উদয় হয়। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য।

তবে কি। মানে তুমি কি লেখোনি? বানিয়ে বানিয়ে বললে?

হ্যাঁ স্যার। ক্ষীণ কণ্ঠে হাবুর উত্তর আসে।

সুধীরবাবু হতভম্ব। তার কুড়ি বছরের মাস্টারি জীবনে এ সমস্যা একেবারে অভিনব। কখনো শোনেননি।

প্রথমেই তার কান গরম হয়ে উঠল রাগে। কী আস্পর্ধা। বেমালুম ঠকাল আমাকে। বেআদব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় আসে।

চশমার পুরু কাচের ভিতর থেকে সুধীরবাবুর বড়ো বড়ো চোখ দুটোর স্থির দৃষ্টি হাবুর ওপরে নিবদ্ধ। শুধু হাবু নয়, গোটা ক্লাস কাঠ হয়ে আছে ভয়ে। হাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই আতঙ্কিত। হাবু মনে মনে জপছে — হে ভগবান। যা হয় স্কুলে, বাবার কানে যেন না পৌঁছোয়। হে ভগবান দয়া করো।

তখন সুধীরবাবুর মাথায় ঘুরছে—অদ্ভুত কাণ্ড! অতখানি রচনা স্রেফ বানিয়ে বানিয়ে বলে গেল। আর অমন সুন্দর করে। আশ্চর্য ! সত্যি বলতে কী তাঁর ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলেন—সাবাস।

নাঃ, অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। ক্লাসে ডিসিপ্লিন রাখা তাহলে শক্ত হয়ে পড়বে। হয়তো এরপর থেকে প্রত্যেক ছেলে না লিখে বানিয়ে বলবার চেষ্টা করবে হাবুর দেখাদেখি। অবশ্য আর কারো ক্ষমতা নেই অমন বানায়। এমন কী ফার্স্টবয় প্রশান্তরও সাধ্য নেই।
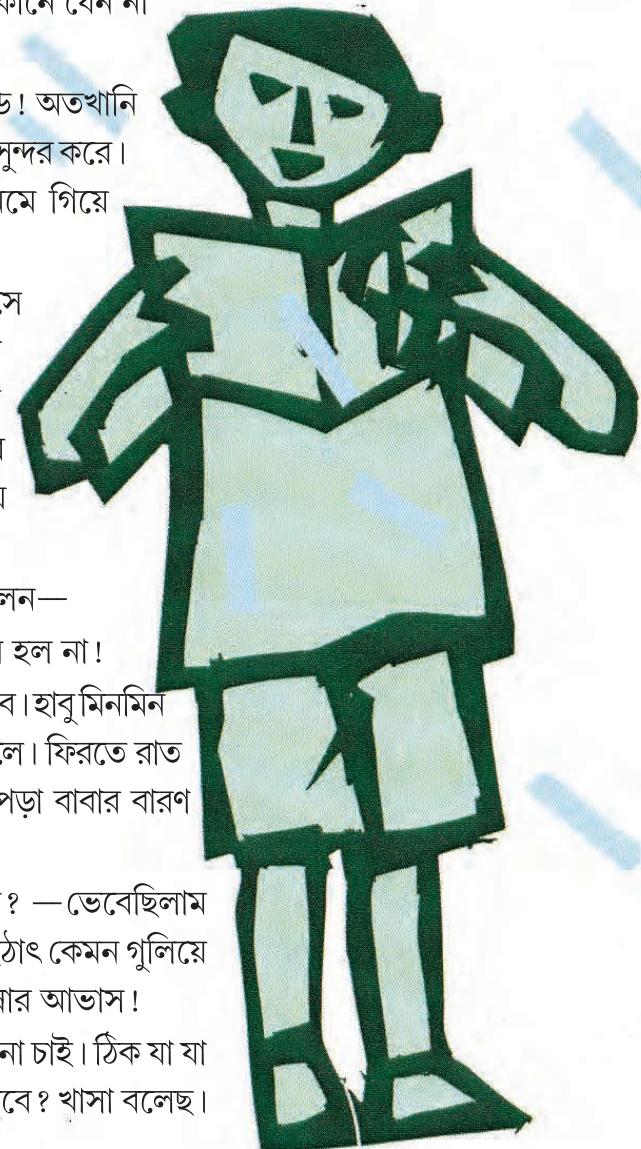
থমথমে মুখে গুরুগম্ভীর স্বরে সুধীরবাবু বললেন—

কী? লেখোনি কেন? দু-সপ্তাহের মধ্যে সময় হল না!

আজ্ঞে ভেবেছিলাম কাল সন্ধেবেলা লিখে ফেলব। হাবু মিনমিন করে। কিন্তু গোপালপুরে মেলায় গিয়েছিলাম বিকেলে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখি খেতে দিচ্ছে। খেয়ে উঠে পড়া বাবার বারণ তাই—

হুম! তা সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারতে? —ভেবেছিলাম করব।— ও তারপর বুঝি বুদ্ধি জাগল? না স্যার! হঠাৎ কেমন গুলিয়ে গেল! আর কখনো হবে না স্যার! হাবুর কণ্ঠে কান্নার আভাস!

বেশ! মনে থাকে যেন! আর কাল আমার রচনা চাই। ঠিক যা যা বললে সব পরিষ্কার করে লিখে আনবে। মনে থাকবে? খাসা বলেছ।

হা
তে
ক
ল
মে

অজেয় রায় (১৯৩৭—২০০৮) : শান্তিনিকেতনে বসবাস করতেন। *সন্দেশ*, *কিশোর ভারতী*, *শুকতারা* প্রভৃতি ছোটোদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লেখায় দক্ষ ছিলেন। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল চাক্ষুষ পরিচয়। সুঅভিনেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো *মুণ্ডু*, *কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন*, *আমাজনের গহনে* ইত্যাদি।

১.১ অজেয় রায়ের লেখা একটি জনপ্রিয় বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন কোন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ প্রফুল্লর রচনা সুধীরবাবুর কেন পছন্দ হয়নি?

২.২ নিতাই শাস্তি পেল কেন?

২.৩ সুধীরবাবু কোন অন্যায়কে ক্ষমা করেন না?

২.৪ সুধীরবাবুর কপালের ভাঁজ কীসের চিহ্ন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?

৩.২ ‘ছেলেটা চর্চা রাখলে বড়ো হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।’— ছেলেটি সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ কী?

৩.৩ ‘মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে।’ — পাতা ওল্টানোর কারণ লেখো।

৩.৪ ‘বেমালুম ঠকাল আমাকে’— হাবুল কি সত্যিই মাস্টারমশাইকে ঠকিয়েছিল?

৩.৫ হাবুলের রচনা শুনে সুধীরবাবুর হাবুলকে কী বলার ইচ্ছে হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছে তিনি পূরণ করলেন না কেন?

শব্দার্থ : ভারিক্কি — রাশভারী। কারণ দর্শিয়ে — কারণ দেখাতে বলা। দশাসই — লম্বা চওড়া। মুদ্রাদোষ — ভাবভঙ্গির বা কথা বলার ধরনের অস্বাভাবিক অভ্যাস। মৌলিক — অবিভাজ্য। সন্ধানী — সন্ধানকারী। বিস্ফারিত — বিকশিত, প্রসারিত। পৌরাণিক আখ্যান — পুরাণের গল্প। বেমালুম — বোঝা যায় না এমন।

৪. **নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করে, তা ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করো:**

প্রশান্ত, অবহেলা, দুর্ভোগ, অনাবৃষ্টি, বেমালুম।

৫. **'পাল্লা' শব্দটিকে দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দু'টি বাক্য লেখো।**

৬. **নীচের বাক্যগুলি থেকে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া খুঁজে বের করে ছকের মধ্যে লেখো :**

৬.১ আমি রচনা লিখতে বলেছি।

৬.২ হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগায়।

৬.৩ ছেলেরা যে যার রচনা খাতা বের করে ওপরে রাখে।

৬.৪ তিনি ঘড়ি দেখলেন।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

৭. **বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে আলাদা করো :**

৭.১ ভজটা কিছুতেই ছাড়ল না।

৭.২ সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

৭.৩ হাবু শুয়ে কান পেতে শোনে।

৭.৪ দুর্গাপূজার পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৮. **ঠিক উত্তরে '✓' চিহ্ন দাও।**

৮.১ হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন। (যৌগিক বাক্য/সরল বাক্য)

৮.২ গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাইবাড়িতে কীর্তন শুনছেন। (জটিল বাক্য/যৌগিক বাক্য)
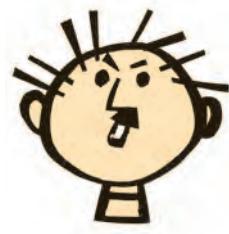
৮.৩ ফের যদি রচনা আনতে ভুল হয়, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। (সরল বাক্য/জটিল বাক্য)

৯. **নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বের করো এবং নিম্নরেখ পদের বিভক্তি উল্লেখ করো :**

৯.১ বাবার কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে।

৯.২ উঠানে কিছু ছেলে খেলছে।

৯.৩ কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন।

৯.৪ দে সরকারের রচনার বই থেকে হুবহু টুকে এনেছ।

১০. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১০.১ স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে হাবুর কী মনে হচ্ছিল?

১০.২ তার চোখে স্কুলের ভেতরের কোন ছবি ধরা পড়ে?

১০.৩ হাবু শেষের দিকের বেঞ্চে বসতে চায় না কেন? সে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে বসে?

১০.৪ 'এইটাই সুধীরবাবুর মেথড'— সুধীরবাবুর মেথডটি কী? তাঁর এমন মেথড অবলম্বন করার যুক্তিটি কী?

১০.৫ রচনা পড়ার সময় প্রফুল্লকে সুধীরবাবু থামিয়ে দিলেন কেন? তাঁকে তিনি কোন পরামর্শ দিলেন?

১০.৬ 'সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ।'— কী সেই 'মুদ্রাদোষ'? কখনই বা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল?

১০.৭ 'তবেই রচনায় প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে।'—সুধীরবাবুর মতে কীভাবে একটি রচনা সাহিত্যিক মূল্যে অনন্য হয়ে ওঠে?

১০.৮ 'শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল।' —হাবু ওরফে হাবুলচন্দ্রের রচনা পড়াকে প্রশান্তর 'আবোল তাবোল' মনে হয়েছে কেন? তুমি কী এর সঙ্গে একমত?

১০.৯ 'তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল' —কোন রহস্যের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তার জট ছাড়ল?

১০.১০ 'না, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।' —কার মনে এমন চিন্তার উদয় হলো? সত্যিই কি তোমার সেই চিন্তাকে বাড়াবাড়ি মনে হয়?

১০.১১ 'তা সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারতে' —সুধীরবাবু হাবুকে যে একথা বললেন, সেই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ না থাকার জন্য তিনি নিজেই কতখানি দায়ী বলে তোমার মনে হয়?

১০.১২ গল্পে কঠোর মাস্টারমশাই সুধীরবাবুর মধ্যেও এক স্নেহপ্রবণ, নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, প্রশ্রয়দাতা মানুষ লুকিয়ে ছিল— আলোচনা করো।

১১. হাবু শ্রেণিকক্ষে যেভাবে নিজের মনে বানিয়ে চটজলদি রচনা বলে গেছে এমন বলার ক্ষমতা একটা অসাধারণ গুণ। তোমরা খেলার সময় বন্ধুরা টুকরো টুকরো বিষয় নিয়ে এ ব্যাপারে চর্চা করতে পারো।

মিলিয়ে পড়ো

তথাকথিত পরীক্ষা মানেই ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ।
পাশাপাশি সম্পূর্ণ অন্যরকম পরীক্ষার এই গল্পটি পড়ো।

না পাহারার পরীক্ষা

শঙ্খ ঘোষ

পরীক্ষা দিতে তোমাদের একেবারেই ভালো লাগে না তো? না কি লাগে? আমাদের কিন্তু লাগত না। পড়াশোনা তো ভালোই, তবে পরীক্ষার কথা ভাবলেই হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। দুঃস্বপ্ন যেন।

অথচ, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলে, দু-একবার এমনই হলো যে, পরীক্ষাটাও হয়ে উঠল বেশ একটা মজার ব্যাপার।

কীভাবে জানো?

হেডমাস্টারমশাই একবার ক্লাসে এসে বললেন : 'একটা জিনিস কখনও কি ভেবে দেখছ তোমরা? এই যে পরীক্ষার সময়ে হলঘরে মাস্টারমশাইরা ঘুরে বেড়ান গার্ড হয়ে, তোমাদের পক্ষে এটা খুব লজ্জার কথা নয়?'

লজ্জা? লজ্জা কেন? হেডমাস্টারমশাই কি ভয়টাকেই ভুল করে লজ্জা বলছেন? খসখস করে লিখে চলেছে সবাই খাতার পাতায়, আর মাস্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরে, কিংবা বসে আছেন চেয়ারে, আর মাঝেমাঝে হেঁকে উঠছেন 'নো হামিং, নো হামিং' —

ভাবলেই বেশ ভয় হয় না? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওখান থেকেই তো আসছে 'হামিং', আমরা আর করছি কতটুকু? কিন্তু সেকথা সাহস করে আর বলে কে! ঘাড় নীচু করে লিখতে লিখতে হয়তো টের পাচ্ছি যে ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন, পড়ে যাচ্ছেন আমার লেখা, তখন কি লিখতে আর কলম সরে? নাঃ, লজ্জার কথা মনে হয়নি কখনও। মাস্টারমশাইরা পাহারাদার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরীক্ষার ঘরে, এ ছবিটা ভাবলে কেবল ভয়েরই কথা মনে হতো আমাদের।

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই আমাদের বোঝালেন যে ভয় নয়, এর মধ্যে আছে একটা লজ্জা। 'কেন তোমাদের পাহারা দিতে হবে? ঘরে যদি কেউ না থাকে তাহলেই কি তোমরা এ ওর দেখে লিখবে? বই খুলে লিখবে? মাস্টারমশাইরা কি কেবল সেইটে ঠেকাবার জন্য বসে থাকবেন ঘরে পুলিশ হয়ে? পরীক্ষার ঘর কি তবে একটা চোর-পুলিশের খেলা? দেখো তো ভেবে? তোমাদের কি এইটুকুও বিশ্বাস করা যাবে না? শুধু সন্দেহই করতে হবে?'

এরকম করে ভাবিনি বটে আগে। কিন্তু এও তো সত্যি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানারকম ফন্দি করেই পরীক্ষা দিতে চাইত। টুকরো টুকরো কাগজ বার করত পকেট বা জামার হাতা থেকে, ঝুঁকে পড়ত এ ওর খাতায়। সেইসব ঠেকাবার জন্যই তো ঘুরে বেড়াতে হতো মাস্টারমশাই। লেখা শেষ হলে জমা দিয়ে যাবে খাতা।'

হেডমাস্টারমশাই বললেন : 'তাই ঠিক করেছি যে তোমাদের পরীক্ষার ঘরে পাহারার জন্য পাঠাব না আর কাউকে। খাতা আর প্রশ্নপত্র দিয়ে চলে যাবেন মাস্টারমশাই, ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই লিখবে তোমরা, লেখা শেষ হলে জমা দিয়ে যাবে খাতা।'

বিহ্বল একটি ছেলে বলে উঠল হঠাৎ : 'কিন্তু কেউ যদি নকল করে সত্যি সত্যি?'

'কেন করবে? আর যদিই বা করে, তাকে কি ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে হবে? যদি ধরো তোমাদের ভার তোমাদেরই ওপর দিতে চাই, নেবে না সে-ভার? কাজটা যে ভালো নয়, এটা যদি তোমরা বুঝতে পারো, সে-কাজ নিশ্চয় নিজে থেকেই বন্ধ করবে তোমরা? আর, ভালো নয় বুঝেও কাজটা যদি করে কেউ, তাহলে সে তা করবে। পুলিশি করে ঠেকাতে চাই না তা। কী, রাজি তো সবাই? নিজের ভার নিজে নিতে?'

কী আশ্চর্য, আমরা কেন রাজি থাকব না? ঘরে থাকবেন না কেউ আর আমরা দেব পরীক্ষা, আমাদের এতে অরাজি হওয়ার তো কথাটি ওঠে না মোটে। কিন্তু মাস্টারমশাইরা রাজি হবেন তো?

ফুর্তির একটা ঢেউ উঠল গোটা ইস্কুল জুড়ে। ইনভিজিলেটর থাকবে না কেউ, পরীক্ষা দেব নিজেরা নিজেরা! আঃ, ভারি একটা নতুনরকমের কাণ্ড হবে।

তারপর একদিন এসে গেল পরীক্ষা। ভিন্নরকম একটা উত্তেজনা হচ্ছে আমাদের। আমাদের বিশ্বাস করা হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেই বিশ্বাসের সেই দায়িত্বের একটা মর্যাদা দিতে হবে— অন্য মাস্টারমশাইরাও কদিন ধরে বুঝিয়ে বলছেন সেই কথা। মর্যাদা দেবারই ভঙ্গি নিয়ে ক্লাসঘরে গিয়ে বসেছি আমরা, খাতা দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে চলে গেছেন মাস্টারমশাই, কলম খুলে শুরু করেছি লেখা।

স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে যে ছেলেটি, সবচেয়ে না-পড়ুয়া, দুষ্টুবুদ্ধিতে ভরাট, ধরা যাক 'হৃদয়' তার নাম , সে বসেছে একেবারে পিছনের বেঞ্চে। তার বসা দেখে সবাই বুঝে নিয়েছে যে নিরিবিলি আপনমনে তার নকল করা আজ ঠেকাতে পারবে না কেউ। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই তো বলেই দিয়েছেন যে চানও না তিনি ঠেকাতে, নকল যদি কেউ করতে চায় তো করুক, সে তার নিজের দায়িত্ব। তাই ও নিয়ে আর ভাবছিলাম না আমরা। আত্মমর্যাদায় গরীয়ান হয়ে লিখে যাচ্ছিলাম সবাই।

কেটে গেছে বেশ খানিকটা সময়। হঠাৎ চমকে উঠি পিছন থেকে একটা তর্জন শুনে: 'অ্যাই, ঘাড় ঘোরাচ্ছিস কেন? লিখে যা নিজের মতো। ইঃ ঘাড় ঘোরাচ্ছে!'

সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরে দেখি, কথাটা বলছে হৃদয়। বলছে: 'ভেবেছিস তোদের দেখবার কেউ নেই? আমি আছি। আমি তো আর লিখতে পারব না কিছু, পড়ে তো আসিনি, তাই আমিই তোদের দেখব। লেখ মন দিয়ে—'
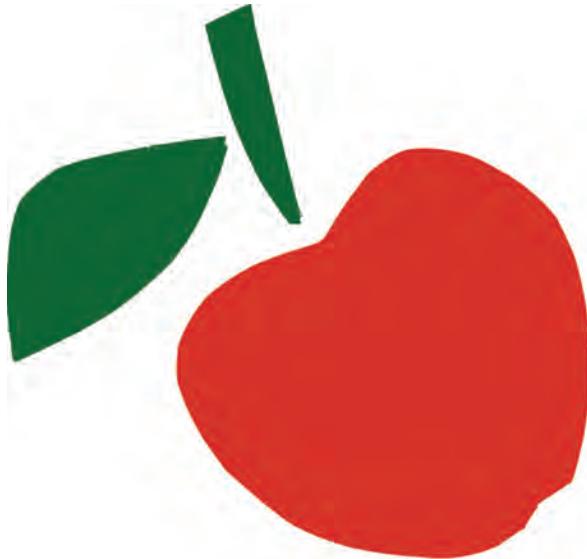
ঘাড় যে ঘোরাচ্ছিল তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না, একটু হেসে সে আবার শুরু করল লেখা, শুরু করলাম আমরাও। ঘণ্টা পড়ে গেলে সকলের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও জমা দিল তার ফাঁকা খাতা। কিন্তু সেই ফাঁকা খাতা, সেই শূন্য খাতাই সেদিন যেন হয়ে উঠল হেডমাস্টারমশাইয়ের মস্ত এক জয়তিলক, আমাদেরও।

না বললেও চলে, বুঝতেই পারছ, সেই ছোট্ট পরীক্ষাটাতে পাশ করেনি হৃদয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পড়াশোনা করে, বেশ ভালোভাবেই সে টপ্‌কে গেল ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা। আমাদের সেই শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল অন্য এক শহরে গিয়ে, নাটোরে। পরীক্ষায় পাহারা দিতে দিতে সেখানকার শিক্ষক-প্রহরীরা যখন বলছিলেন, 'এ-ঘরে তো না থাকলেও চলে দেখি, এরা তো মুখও তোলে না', ইস্কুলের ছেলেরা তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল মর্যাদাভরা খুশিতে, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলের ছোট্ট একটা মর্যাদায়।

কিশোর বিজ্ঞানী

অন্নদাশঙ্কর রায়

এক যে ছিল কিশোর, তার
মন লাগে না খেলায়
ছুটি পেলেই যায় সে ছুটে
সমুদ্দুরের বেলায়।

সেখানে সে বেড়ায় হেঁটে
এধার থেকে ওধার
বাড়ি ফেরার নাম করে না
হোক না যত আঁধার।

কুড়িয়ে তোলে নানা রঙের
নকশা আঁকা ঝিনুক
এক একটি রতন যেন
নাই বা কেউ চিনুক।

বড়ো হয়ে ঝিনুক কুড়োয়
জ্ঞানের সাগরবেলায়।
ঝিনুক তো নয়, বিদ্যা রতন
মাড়িয়ে না যায় হেলায়।

বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে,
'কী আপনার বাণী।
বলে গেছেন যা নিউটন
পরম বিজ্ঞানী—

'অনন্তপার জ্ঞান পারাবার
রত্নভরা পুরী
তারই বেলায় কুড়িয়ে গেলেম
কয়েক মুঠি নুড়ি।'

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—২০০২) : জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। প্রথম জীবনে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তী জীবনে বাংলাভাষায় বহু মননশীল উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *তারুণ্য*। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে পথে *প্রবাসে, সত্যাসত্য, যার যেথা দেশ* প্রভৃতি। তাঁর লেখা *উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙা ধানের খই* প্রভৃতি ছড়ার বই ছোটোদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অন্নদাশংকর রায় লীলাময় রায় ছদ্মনামেও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১.১ অন্নদাশংকর রায় প্রথম জীবনে কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন?

১.২ তাঁর লেখা দুটি ছোটোদের ছড়ার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ কিশোরের মন লাগেনা কীসে?

২.২ কখন কিশোর মন সমুদ্দুরের বেলায় যেতে চায়?

২.৩ অনুসন্ধিৎসু কিশোরটি সাগরবেলায় কী কুড়িয়ে তোলে?

২.৪ কোন পারাবারকে ‘অনন্তপার’ বলা হয়েছে?

২.৫ দুজন প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম লেখ।

শব্দার্থ : নকশা — স্কেচ, রেখাচিত্র। মাড়িয়ে — পায়ে দলে। সুধায় — অমৃতে। অনন্তপার — অন্তহীন মহাবিশ্ব। জ্ঞান পারাবার — জ্ঞানের সমুদ্র।

৩. **কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :** আলো, ছোটো, এখানে, তখন।

৪. **প্রতিটি শব্দকে পৃথক অর্থে আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করো :** সুধায়, পুরী, বেলা, হেলা, ভরা।

৫. **আবিষ্কারের গল্পগুলির পাশে পাশে আবিষ্কারকের নাম উল্লেখ করো এবং তাঁদের সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করো :** ঘড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও, দূরবীন, টেলিভিশন।

৬. ছুটি পেলে তোমার মন কী করতে চায় পাঁচটি বাক্যে লেখো।

৭. কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে নীচের শব্দছকটি পূরণ করো :

ধা

ত্ন

ত

পা ট

ঙে
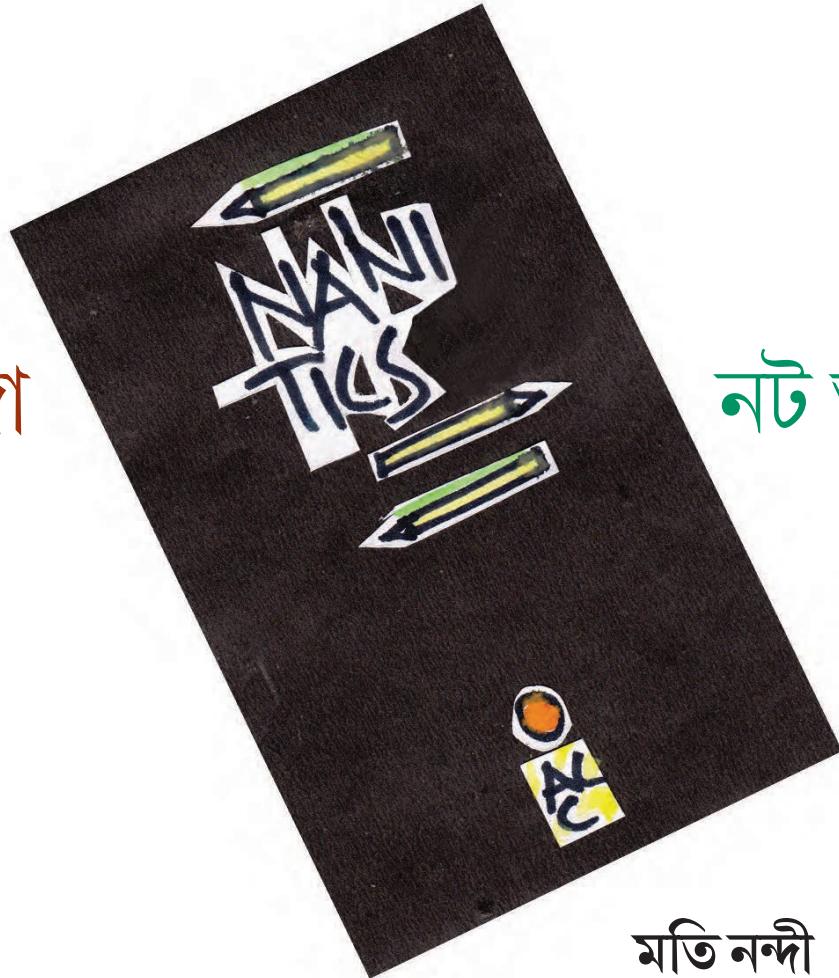
শো

৮. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৮.১ পাঠ্য ছড়াটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি শুরু হয়েছে ‘এক যে ছিল কিশোর...’ — এইভাবে। সাধারণত কোন ধরনের রচনা এভাবে শুরু হয়ে থাকে? সেই ধরনের রচনার বিষয়ের সঙ্গে ছড়াটির বিষয়গত সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো।

৮.২ ‘মন লাগে না খেলায়’ — কার খেলায় ‘মন লাগে না’? কিশোরেরা সাধারণত কোন ধরনের খেলাধুলো করে থাকে? তার পরিবর্তে ছড়ার কিশোরটি কী করতে পছন্দ করত?

৮.৩ ‘এক একটি রতন যেন/নাই বা কেউ চিনুক।’ — কোন জিনিসকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কেনই বা এ ধরনের তুলনা? তাকে চেনা বা না চেনার প্রসঙ্গই বা এল কেন?

৮.৪ সেদিনের কিশোরটি পরিণত বয়সে উপনীত হলে তাকে কী করতে দেখা যায়?

৮.৫ ‘ঝিনুক কুড়োয়/জ্ঞানের সাগরবেলায়’ — অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৮.৬ ‘বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে’ — কে এখন ‘বৃদ্ধ’? লোকে তাকে কী জিজ্ঞেস করে? তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কী বলেন?

৮.৭ কোন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রসঙ্গ ছড়াটিতে রয়েছে? বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

ননীদা নট আউট

মতি নন্দী

রুপোলি সংঘের সঙ্গে সি সি এইচ-এর হাড্ডাহাড্ডির শুরু পঁচিশ বছর আগে শনিবারের একটা ফ্রেন্ডলি হাফ-ডে খেলা থেকে। ননীদা এমন এক ননীটিকস প্রয়োগ করে ম্যাচটিকে ড্র করান, যার ফলে এগারো বছর রুপোলি সংঘ আমাদের সঙ্গে আর খেলেনি। গল্পটা শুনেছি মোনা চৌধুরির (অধুনা মৃত) কাছে। মোনাদা এ খেলায় ক্যাপ্টেন ছিলেন। উনি না বললে, এটাকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।

সি সি এইচ প্রথম ব্যাট করে ১৪ রানে সব আউট হয়ে যায়। মোনাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ড্রেসিংরুমে। সবারই মুখ থমথম। এক ওভার কি দু-ওভারেই রুপোলি সংঘ রানটা তুলে নেবে। ওদের ড্রেসিংরুম থেকে নানান ঠাট্টা এদিকে পাঠানো হচ্ছে। কটা বলের মধ্যে খেলা শেষ হবে তাই নিয়ে বাজি ধরছে। রুপোলির ক্যাপ্টেন এসে বলল, ‘মোনা, আমরা সেকেন্ড ইনিংস খেলে জিততে চাই, রাজি?’ মোনাদা জবাব দেবার আগেই ননীদা বলে উঠলেন, ‘নিশ্চয় আমরা খেলব। তবে ফার্স্ট ইনিংস আগে শেষ হোক তো!’

সবাই অবাক হয়ে তাকল ননীদার দিকে। রুপোলির ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে, ‘তাই নাকি?’ বলে চলে গেল। ননীদা বললেন, ‘এ ম্যাচ রুপোলি জিততে পারবে না। তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে।”

মোনাদা খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন রুপোলির ক্যাপ্টেনের কথায়, তাই রাজি হয়ে গেলেন। তখন বিষ্টুকে একধারে ডেকে নিয়ে ননীদা তাকে কী সব বোঝাতে শুরু করলেন আর বিষ্টু শুধু ঘাড় নেড়ে যেতে থাকলো। তিরিশ মাইল রোডরেসে বিষ্টু পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন। শুধু ফিলডিংয়ের জন্যই ওকে মাঝে মাঝে দলে নেওয়া হয়। ব্যাট চালায় গাঁইতির মতো, তাতে অনেক সময় একটা-দুটো ছক্কা উঠে আসে।
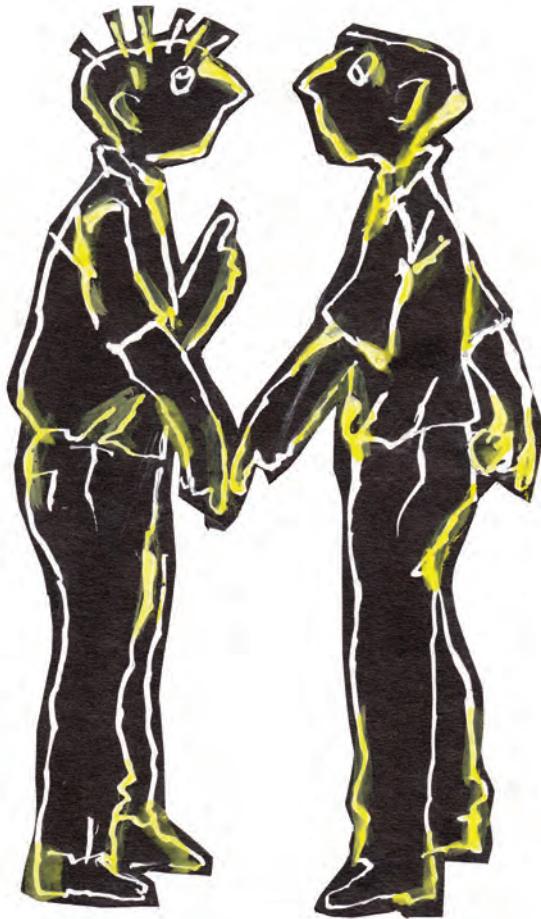
রুপোলি ব্যাট করতে নামল। ননীদা প্রথম ওভার নিজে বল করতে এলেন। প্রথম বলটা লেগস্টাম্পের এত বাইরে যে, ওয়াইড সংকেত দেখাল লেগ আম্পায়ার। দ্বিতীয় বলে ননীদার মাথার দশ হাত উপর দিয়ে ছয়। তৃতীয় বল পয়েন্ট দিয়ে চার। পরের দুটি বলে, আশ্চর্য রকমের ফিল্ডিংয়ে কোনো রান হলো না। শেষ বলেই লেগবাই। বিষ্টু লং অন থেকে ডিপ ফাইন লেগে যেভাবে দৌড়ে এসে বল ধরে, তাতে নাকি রোম ওলিম্পিকের ১০০ মিটারে সোনার মেডেল পাওয়া যেত। তা না পেলেও বিষ্টু নির্ঘাত বাউন্ডারি বাঁচিয়ে যখন উইকেটকিপারকে বল ছুড়ে দিল, রুপোলির দুই ব্যাটসম্যান তখন তিনটি রান শেষ করে হাঁফাচ্ছে।

ওভার শেষ। স্কোর এখন সমান-সমান। দু-দলেরই ১৪। বিষণ্ণতায় সি সি এইচ-এর সকলের মুখ ম্লান। শুধু ননীদার মুখে কোনো বিকার নেই। সাধারণত অতুল মুখুজ্জেই এরপর বল করে। সে এগিয়ে আসছে কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করে ননীদা বলটা দিলেন বিষ্টুর হাতে। সবাই অবাক। বিষ্টু তো জীবনে বল করেনি! কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে, ননীদা যা বলবেন তাই করতে হবে। বিষ্টু গুনে গুনে ছাব্বিশ কদম গিয়ে মাটিতে বুটের ডগা দিয়ে বোলিং মার্ক কাটল। ব্যাটসম্যান খেলার জন্য তৈরি। বিষ্টু তারপর উইকেটের দিকে ছুটতে শুরু করল।

বোলিং ক্রিজে পৌঁছোবার আগে অদ্ভুত এক কান্ড ঘটল। বিষ্টু আবার পিছু হটতে শুরু করেছে। তারপর গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। সারা মাঠ অবাক, শুধু ননীদা ছাড়া।

বিষ্টু কি পাগল হয়ে গেলো? ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, ঘুরছে আবার পাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু বল হাতেই রয়েছে।

‘এ কী ব্যাপার!’ রুপোলির ব্যাটসম্যান কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, ‘বোলার এভাবে ছুটোছুটি করছে কেন?’

ননীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘বল করতে আসছে।’

‘এসে পৌঁছবে কখন?’

‘পাঁচটার পর। যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।’

এরপরই আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হলো। ননীদা যেন তৈরিই ছিলেন, ফস করে পকেট থেকে ক্রিকেট আইনের বই বের করে দেখিয়ে দিলেন, বোলার কতখানি দূরত্ব ছুটে এসে বল করবে, সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। সারাদিন সে ছুটতে পারে বল ডেলিভারির আগে পর্যন্ত।

বিষ্টু যা করছিল তাই করে যেতে লাগল। ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না, যদি তখন বোল্ড করে দেয়! ফিল্ডাররা কেউ শুয়ে, কেউ বসে। ননীদা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন আর হিসেব করে বিষ্টুকে চেঁচিয়ে বলছেন, ‘আর দেড় ঘণ্টা!’ ... ‘আরও এক ঘণ্টা!’... ‘মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট’!

কথা আছে পাঁচটায় খেলা শেষ হবে। পাঁচটা বাজতে পাঁচে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হলো। বল ডেলিভারি দিতে বোলার ছুটছে, তার মাঝেই খেলা শেষ করা যায় কিনা? দুই আম্পায়ার আলোচনা করে ঠিক করলেন, তা হলে সেটা বেআইনি হবে।

সুতরাং বিষ্টুর পাক দিয়ে দিয়ে দৌড়োনো বন্ধ হলো না। মাঠের ধারে লোক জমেছে। তাদের অনেকে বাড়ি চলে গেল। অনেক লোক খবর পেয়ে দেখতে এল। ব্যাটসম্যান সান্ত্রীর মতো উইকেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা নামল। বিষ্টু ছুটেই চলেছে। চাঁদ উঠল আকাশে। ফিল্ডাররা শুয়েছিল মাটিতে। ননীদা তাদের তুলে ছজনকে উইকেটকিপারের পিছনে দাঁড় করালেন, বাই রান বাঁচাবার জন্য। এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিল।

রুপোলির ব্যাটসম্যান অন্ধকারে ব্যাট চালাল এবং ফসকাল। সেকেন্ড শ্লিপের পেটে লেগে বলটা জমে গেল। ননীদা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ম্যাচ ড্র।’

রুপোলির ব্যাটসম্যান প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, বল ডেলিভারির মাঝে যদি খেলা শেষ করা না যায়, তাহলে ওভারের মাঝেও খেলা শেষ করা যাবে না। শুরু হলো তর্কাতর্কি। বিষ্টুকে আরও পাঁচটা বল করে ওভার শেষ করতে হলে, জেতার জন্য রুপোলি একটা রান করে ফেলবেই — বাই, লেগবাই, ওয়াইড যেভাবেই হোক। কিন্তু ননীদাকে দমানো সহজ কথা নয়। ফস করে তিনি আলোর অভাবের আপিল করে বসলেন। চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।

আমার ধারণা, মোনাদা কিছুটা রং ফলিয়ে আমাকে গল্পটা বলেছেন। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তগুলো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচে হলেও, ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ননীদাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তুলবে না।

মতি নন্দী (১৯৩৩ — ২০১০) : জন্মস্থান কলকাতা। কিশোর বয়স থেকেই খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। একটি বিখ্যাত দৈনিকের ক্রীড়া বিভাগের সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই বিভাগের সম্পাদক হয়েছিলেন। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, সাঁতার ইত্যাদি প্রায় সবধরনের খেলা নিয়ে তিনি অসামান্য সব গল্প উপন্যাস লিখেছেন। ক্রিকেটের একচ্ছত্র সম্রাট স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের জীবনকথা বাংলাভাষায় লিখেছেন মতি নন্দী। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে *ননীদা নট আউট, কোনি, স্ট্রাইকার, স্টপার, কলাবতী, অপরাজিত আনন্দ, জীবন অনন্ত* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খেলার বিষয় বাদ দিয়েও তিনি অন্যান্য অনেক গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। *সাদা খাম* নামক উপন্যাসের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছিলেন। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *ননীদা নটআউট* মূলগ্রন্থটির অংশবিশেষ।

১.১ মতি নন্দীর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন ক্রিকেটারের জীবনকথা লিখেছেন?

২. **নীচের শব্দগুলির বর্ণ বিশ্লেষণ করে মৌলিক ও যৌগিক বর্ণগুলিকে ছকের ঠিক ঠিক ঘরে বসাও :**

তৈরি, পৌঁছোবার, দৌড়ানো, চৌধুরি।

শব্দ	বর্ণ-বিশ্লেষণ	মৌলিক শব্দ	যৌগিক শব্দ

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে লেখো :**

খেলা, জবাব, অপমানিত, বিষণ্ণতা, উদ্ভব।

৪. **চার, পাঁচ, এগারো, পঁচিশ, তিরিশ** — এই শব্দগুলিকে ব্যাকরণগতভাবে আমরা কী বলি? এদের পূরণবাচক রূপটি লেখো।

৫. **নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করে দেখাও এবং তা দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে লেখো।**

প্রতিশব্দ, হাফ-ডে, অতুল, বেফিকির।

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৬.১ রুপোলি সংঘের সঙ্গে কাদের খেলা হয়েছিল?

৬.২ খেলাটিতে ক্যাপ্টেন কে ছিলেন?

৬.৩ সি সি এইচ-এর খেলোয়াড়দের মুখ ম্লান হয়েছিল কেন?

৬.৪ বোলিং ক্রিজে পৌঁছোবার আগে বিষ্টু কী কাণ্ড করেছিল?

৬.৫ ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছাড়ছিল না কেন?

৬.৬ ফিল্ডাররা মাঠে কী করছিল?

৬.৭ সবার মুখ যখন ম্লান তখন ননীদার মুখে কোনো বিকার ছিল না কেন?

শব্দার্থ : অধুনা — সম্প্রতি। তর্কাতর্কি — বচসা। উদ্ভব — উৎপত্তি। মঞ্জুর — অনুমোদিত।

৭. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৭.১ 'এটাকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।' — বক্তার এহেন মন্তব্যের কারণ কী? শিবরামের গল্পের কোন বিশেষত্বের গুণে তাঁর এমন মন্তব্য?

৭.২ 'সারা মাঠ অবাক, শুধু ননীদা ছাড়া।' — সারা মাঠকে অবাক করে দেওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেছিল? ননীদা সে ঘটনায় অবাক হলেন না কেন?

৭.৩ 'যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।' — খেলা শেষের পর কোন ঘটনা ঘটবে?

৭.৪ 'ক্রিকেটে আইনের বই বার করে দেখিয়ে দিলেন...' — তোমার জানা ক্রিকেটের কিছু আইন যোগ করো। সঙ্গে অন্য কোনো ঘরের/বাইরের খেলার আইনকানুনও যোগ করতে পারো।

৭.৫ 'আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হলো।' — আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিল কেন? মাঠে চূড়ান্ত অস্থিরতার সময় ননীদা কেমন ভূমিকা নিলেন?

৭.৬ 'নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হলো।' — উদ্ভূত নতুন সমস্যাটি বা কী?

৭.৭ 'এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিলো।' — বল ডেলিভারির আগে বিষ্টু যা যা ঘটনা ঘটায় তা বিবৃত করো।

৭.৮ 'চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।' — কোন আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল? আবেদনকারী কে ছিলেন? তার এমন আবেদনের কারণ কী ছিল?

৭.৯ 'তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তুলবে না।' — কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে? সে ঘটনা সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন বলে বক্তার মনে হয়েছে? পাঠ্যাংশটি পড়ে তোমার মনে জাগা প্রশ্নগুলি লেখো।

৮. ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের দাঁড়ানোর বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি
নীচের জায়গাটিতে নির্দেশ করো।

বই পড়ে কত কিছু জানা যায় তার শেষ নেই। যা জানতে চাই তার জন্য ঠিক বইটা খুঁজে নিতে হবে। আর চিনে নিতে হবে তার কয়েকটা অংশ। জানতে হবে কোন বই থেকে কী জানা যাবে। আগে চিনে নিই বই-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

প্রচ্ছদ, জ্যাকেট ও ব্লার্ব : শক্ত বোর্ডের বইকে ঢেকে রাখে একটা মলাট যার খানিক অংশ মুড়ে যায় ঐ বোর্ডের ভিতর দিকে। একে বলে **জ্যাকেট**। ওপরে থাকে বই-এর **প্রচ্ছদ** যাতে বই-এর নাম, লেখকের নাম থাকে। আর ভেতর দিকে মুড়ে থাকা অংশে থাকে বই আর লেখক সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতি। এই পরিচিতি অংশকে বলে **ব্লার্ব**, যার থেকে বইটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ বইটা কী নিয়ে লেখা তা বোঝা যায়।

আখ্যাপত্র ও প্রকাশক : বইটি যে বা যারা ছেপে প্রস্তুত করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁকে বা তাঁদেরকে সাধারণভাবে প্রকাশক বলে। বই-এর **আখ্যাপত্র** বা Title page এর নীচের দিকে থাকে প্রকাশকের নাম। বই ভালো কিনা তা ভালো প্রকাশকের ওপরে নির্ভর করে।

সূচিপত্র : বই-এর আখ্যাপত্রের পরে সূচিপত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বইটাতে কী কী লেখা আছে, কার পরে কী আছে এবং কতটা বেশি বা কম আছে তার বিবরণ থাকে সূচিপত্রে। **সূচিপত্র** দেখে আমরা বুঝতে পারি আমি যতটা জানতে চাইছি বইতে ততটা আছে কিনা।

এর পরে থাকে বই-এর মূল অংশ যেখানে বইটি যে বিষয় নিয়ে লেখা তা পরপর কতকগুলো নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে এমনভাবে সাজানো থাকে যে পড়লেই পুরো বিষয়টা বোঝা যায়। এই ভাগগুলোকে বলে **অধ্যায় বা চ্যাপ্টার** (chapter)। অনেক সময় অধ্যায়গুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকে, কখনো বা এক, দুই, তিন এভাবে সাজানো থাকে। বই-এর আরো কিছু অংশ থাকে যেমন **ভূমিকা , উৎসর্গপত্র, পাদটীকা, উল্লেখপঞ্জি, সূত্রনির্দেশ, নির্ঘণ্ট , ভুল সংশোধন** ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কেও তোমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারো।

এবার আসি নানা রকমের বই-এর কথায়। বাঁধাই হিসাবে বই হয় দু-রকম— বোর্ড বাঁধাই আর পেপারব্যাক। যাতে সব মানুষ বই কিনতে পারেন সে জন্য বই-এর দাম কম রাখার উদ্দেশ্যে একই বই পেপারব্যাক সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করা হয় কারণ পেপারব্যাক সংস্করণের পাতা বা ছাপা কিছুটা সাধারণ মানের হয়। বোর্ড বাঁধাই অনেক বেশি টেকসই হয় কারণ তাতে ভালো পাতা, ভালো ছাপা যেমন থাকে তেমনি তার বাঁধাই খুব ভালো হয়, ফলে সহজে ছেঁড়ে না।

তার নাম ছায়াময়। হয় সে মানুষ, নয় সে শিমুলগড়ের পুরনো ভূত। তবে, মানতেই হবে, সে যদি মানুষ হয়, খুব মহৎ মানুষ। আর যদি ভূত হয়, খুব উপকারী ভূত ছায়াময়। নইলে কি আর অলঙ্কার খুঁজে পেত ইন্দ্রকে ? সেই তো যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলে। আর তাইতেই তো সার্থক হল ইন্দ্রর সেই সুদূর বিলেত থেকে রায়দিঘিতে ছুটে আসা। তোমরা হয়তো ভাবছ, কে ইন্দ্র আর কে অলঙ্কার, সেটাই তো জানা হল না। জানবে, জানবে। কেন-যে শিমুলগড়ে রাতারাতি শোরগোল পড়ে গেল খুন আর চোরাই মোহর নিয়ে, কেন-যে কাপালিক কালী বিশ্বাসকে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চায় গগন সাঁপুই, কেন-যে লক্ষ্মণ পাইক শুধু এমন লোক খুঁজে বেড়ায় যার দুটো হাতই বাঁ-হাত কিংবা দন্ত্য ন দিয়ে নামের শুরু—এই সমস্ত কথা জানবে। মজায়, চমকে, রহস্যে ভরপুর এই দুর্দান্ত উপন্যাসে।

ব্লার্ব

আমরা যত ধরনের বই ব্যবহার করি তাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় **সাধারণ বই** আর **আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই**। তোমাদের পাঠ্য বই বা গল্প, কবিতা নাটকের বই এগুলোকে সাধারণ বই -এর ভাগে রাখা যায়। আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই কিন্তু একেবারে আলাদা। নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানতে রেফারেন্স বই ব্যবহার করতে হয়। যেমন ধরা যাক কেউ জানতে চাইল 'ঋক্ষ' শব্দের অর্থ কী ? আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি **বাংলা অভিধান** দেখতে। অভিধান এক ধরনের রেফারেন্স বই আ আকরগ্রন্থ। অভিধান একবার দেখতে শিখলে আর পড়ায় কোনো বাধা থাকে না। যে কোনো অজানা শব্দের মানে বুঝতে পারলেই বেশ ঝরঝর করে পড়া যায়। অভিধান দেখাও খুব সহজ। ঠিক যেমন করে আমরা বর্ণমালায় *অ-আ-ই-ঈ* পাই তেমনি অভিধানে *অ*-দিয়ে শব্দ আগে সাজানো থাকবে, তারপরে আসবে *আ*-দিয়ে শব্দগুলো। *অ*-দিয়ে যত শব্দ আছে সেগুলোও কিন্তু ঐ একই নিয়মে *অ*-এর মধ্যে সাজানো থাকবে। এভাবে *অ* থেকে *হ* পর্যন্ত যত শব্দ আছে সবগুলো পরপর থাকবে আর পাশে থাকবে শব্দের অর্থ। এই রকম শব্দ সাজানোর পদ্ধতিকে বলে **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস**। প্রতি ভাষার অভিধান আছে। বাংলা থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরাজি, ইংরাজি থেকে বাংলা, ইংরাজি থেকে ইংরাজি। আবার এক

ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তরজমার অভিধানও আছে। যেমন ফরাসি থেকে জার্মান, উর্দু থেকে বাংলা। নানারকম ভাষার আলাদা অভিধান পাওয়া যায়। এছাড়াও সাহিত্যাভিধান, ইতিহাস অভিধান, ব্যাকরণ অভিধান প্রভৃতি নানা ধরনের অভিধানও হয়।

রেফারেন্স বই কিন্তু টানা পড়া হয় না, যখন দরকার হয়, তখনই এর ব্যবহার। কিন্তু সাধারণ বই আমরা টানা পড়তে পারি। কেবল একটা শব্দের মানে দেখার জন্যেই অভিধান দেখার দরকার হতে পারে কিন্তু আমরা কি কেউ কখনো গল্পের এক লাইন পড়ে পড়া বন্ধ করি? তাছাড়া রেফারেন্স বই একটা নির্দিষ্ট ধরনে সাজানো থাকে কিন্তু সাধারণ বই বিষয় ধরে বা গল্পের মতো টানা লেখা হয়। অভিধান ছাড়াও আরো অনেক রকমের আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই আছে যেমন অ্যাটলাস বা মানচিত্র—যা থেকে কোন জায়গা ঠিক কেমন দেখতে আর পৃথিবীর বুকে সে ঠিক কোন জায়গায় আছে তা জানা যায়। কোনো বড়ো মানুষের জীবনী জানতে গেলে জীবনী জাতীয় কোনো রেফারেন্স বই, আবার কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে সেই জায়গা সম্পর্কে জানতে লাগে **গাইড বই বা সন্ধান বই** জাতীয় আকরগ্রন্থ। তাহলে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে কোনো বিষয় আমাদের পাঠ্যবই-এর পাশাপাশি রেফারেন্স বই বলে যে অন্যান্য বই-এর তালিকা দেওয়া হয় তা কিন্তু বই পড়ার সাবেক কায়দাকানুন মতে রেফারেন্স বই নয়।

আবার পত্রিকা বা ম্যাগাজিন বের হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন প্রতি সপ্তাহে, প্রতি পনেরো দিন অন্তর, বা প্রতি মাসে। যতদিন অন্তর বের হয় সে অনুসারে পত্রিকাগুলোকে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক এইরকম সব নামে ডাকা হয়। অনেক আগে কতগুলি বিখ্যাত পত্রিকা শুধু ছোটোদের জন্য প্রকাশিত হতো যেমন *শিশুসাথী*, *মৌচাক*, *রংমশাল*। তা ছাড়া কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়েও পত্রিকা বের হতে পারে, যেমন খেলাধূলা বা বিজ্ঞান নিয়ে পত্রিকার সংখ্যা অনেক। বড়োদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় যেমন ধরো ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে যে সব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে এই সব বিষয়ে নতুন নতুন যেসব ধারণার খোঁজ পাওয়া যায় বা আবিষ্কার হয় সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। এই ধরনের পত্রিকাকে বলে **জার্নাল**। কাজেই একথা সহজেই বলা যায় যে বই ছাড়াও ছাপা যেসব বস্তু থেকে আমরা আমাদের দরকারি তথ্য পাই বা খবর জানতে পারি তার মধ্যে পত্রিকা ও খবরের কাগজ খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয়। সংবাদপত্র আর পত্রিকা দুটোরই একজন সম্পাদক থাকেন যাঁর ওপর দায়িত্ব থাকে কাগজ বা পত্রিকা চালানোর।

বইয়ের প্রচ্ছদ

আখ্যাপত্র

বই আর পত্রিকার মধ্যে কিছু তফাত আছে। বই একটা নামে সাধারণত একবারই ছাপা হয়। সব ছাপা বই বিক্রি হয়ে গেলে তবেই নতুন করে ছাপা হয়। যদি দ্বিতীয়বার ছাপার সময় বইতে আরো নতুন তথ্য যোগ হয় বা আগে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তার সংশোধন করে ছাপা হয় তাহলে বলা হয় বইটির দ্বিতীয় **সংস্করণ** প্রকাশ হলো। কিন্তু পত্রিকা একই নামে বছরের পর বছর একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ হতে থাকে। সেটা বোঝা যায় পত্রিকার নামের তলায় বর্ষ আর সংখ্যা বলে দুটো কথা থেকে। ধরা যাক এই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে একটা পত্রিকা হাতে পেলে যার নামের তলায় লেখা আছে— বর্ষ - ৭ আর সংখ্যা-৪, তারিখ দেওয়া আছে ফেব্রুয়ারি ১৬; পত্রিকাটি যদি পাক্ষিক হয় অর্থাৎ মাসে দুটো করে বের হয় তবে বুঝতে হবে পত্রিকাটি সাত বছর ধরে বের হচ্ছে। আর এই বছরে অর্থাৎ সাত বছরের প্রথম সংখ্যাটি বের হয়েছিল জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে; আর এই বছরে এর শেষ সংখ্যাটি বের হবে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে। তার পরিচয় হবে বর্ষ — ৭, সংখ্যা ২৪।

এবার নিজেরা খুঁজে বার করো :

১। বাংলা ও ইংরাজি ভাষার দুটি বিখ্যাত প্রকাশনার নাম।

২। বাংলা থেকে বাংলা ভাষার দুটি অভিধানের নাম।

৩। বেড়াতে যাবার উপযোগী একটি গাইডবই বা সন্ধানবই-এর নাম।

৪। একটি বাংলা ও একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের নাম।

৫। সংবাদপত্রের কোন পাতায় কী কী খবর কেমনভাবে থাকে?

৬। দুটি ছোটোদের পত্রিকা ও একটি করে বিজ্ঞান এবং খেলাধূলা বিষয়ে প্রকাশিত পত্রিকার নাম।

বই পড়ার ডায়েরি

সংখ্যা	বই পড়ার তারিখ (শুরু থেকে শেষ)	বইয়ের নাম	লেখক	বইটার বিষয় বা ধরন	কোথা থেকে পেয়েছ বা কে পড়তে বলেছেন

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন -২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) **'আমাদের চারপাশের পৃথিবী'**। নানা কবিতায়, ছড়ায়, গানে, গল্পে, গদ্যে এবং ছবিতে কাহিনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের চারপাশের জগতের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন দিক। পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের বর্ণময় জীবনের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে ঠিক তেমনই মানুষের জীবনের পালা-পার্বণ, উৎসব, বিনোদন, খেলা, মজা প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্য বিষয়ও এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে আমাদের দূর ও নিকটবর্তী জগতের প্রাণময় অস্তিত্ব শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইয়েও আছে স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গান, গল্প, এবং কবিতা।
- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্তচিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস।
- শিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর কবি, লেখক,লেখিকাদের নামের বানানের ক্ষেত্রে মূল রূপটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

'হ য ব র ল' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। বইটির 'হাতেকলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকল। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক নতুন-নতুন প্রশ্ন উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি ও পাঠক্রম :

মাসের নাম	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি (প্রথম পর্যায়)	ভরদুপুরে, সেনাপতি শংকর, ● বই পড়ার কায়দা কানুন (২)	প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতার শিক্ষা।
ফেব্রুয়ারি (প্রথম পর্যায়)	পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি, আকাশভরা সূর্য তারা,মন ভালো করা (মেনি)	নদী, গাছ, পাহাড়, পর্বত,মরুভূমি ও মহাকাশ সমেত এই মহাবিশ্বের প্রতি ভালোবাসা ও কৌতূহল।
মার্চ (প্রথম পর্যায়)	পশুপাখির ভাষা, ঘাসফড়িং, কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি (আমার ময়ূর)	কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখিতে ভরা এই প্রাণময় জগতের প্রতি অনুসন্ধিৎসা ও অন্তরঙ্গতা।
এপ্রিল (দ্বিতীয় পর্যায়)	মরশুমের দিনে (খোজা খিজির উৎসব), হাট, দেয়াল চিত্র, ঝুমুর	পালা-পার্বণ, উৎসব, বিনোদন এবং দৈনন্দিনতার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির খোঁজ।
মে (দ্বিতীয় পর্যায়)	পিঁপড়ে, ফাঁকি	মানুষ ও প্রকৃতি।
জুন ও জুলাই (দ্বিতীয় পর্যায়)	উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা, চিত্রগ্রীব, আশীর্বাদ, এক ভূতুড়ে কাণ্ড, বাঘ,	চারপাশের নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনার সঙ্গে পরিচয়।
আগস্ট (তৃতীয় পর্যায়)	বঙ্গ আমার জননী আমার, শহিদ যতীন দাস, চল রে চল সবে	স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আনন্দ।
সেপ্টেম্বর (তৃতীয় পর্যায়)	ধরাতল (সেথায় যেতে যে চায়), হাবুর বিপদ (না পাহারার পরীক্ষা)	পৃথিবী, মানুষ, ও বিদ্যালয় জীবনের বৈচিত্র্য।
অক্টোবর ও নভেম্বর (তৃতীয় পর্যায়)	কিশোর বিজ্ঞানী, ননীদা নট আউট	খেলার মজা এবং অপরাজেয় কৌতূহল।

- দুমাস অন্তর বই পড়া নিয়ে কথা বলুন। প্রত্যেকের 'বইপড়ার ডায়েরি' অংশটি দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।